বাতায়ন
সংকলন

“হরষগীত উচ্ছ্বসিত হে”

বাতায়ন

সম্পাদনা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সংকলন
চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৬

EDITORS
Ranjita Chattopadhyay, Chicago, IL
Jill Charles, IL, USA (Editor, English Section)

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTOGRAPHY
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia
Suparna Chatterjee, Perth, Australia

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: a_banerjee@iinet.net.au

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response. We wish you will enjoy our first printed version of **"BATAYAN"**.

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবাংলায় সবে মাত্র বিধানসভা নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। মার্কিন মুলুকে চলছে জোর উত্তেজনা আসন্ন নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে। আমাদের জাতীয় জীবনে আরও কতরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়মিত ভাবে ঘটে চলেছে। আর এই সবের মধ্যেও অব্যাহত আছে সাধারণ মানুষের জীবনের 'কান্না হাসির দোল দোলান পৌষ ফাগুনের পালা' গান। আমাদের সেইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ধরে রাখার প্রয়াসের ফলশ্রুতি 'বাতায়ন সংকলন সংখ্যা'।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত কম বলে অনেক সময় আমার চিঠিগুলো সঞ্চয় করার ইচ্ছে হয়, যে সব দিন চলে গেছে তাদের স্মরণে বেঁধে রাখার জন্যে। অতীতের ভাণ্ডার থেকে ধার নিয়ে ফাঁকি দিয়ে পরমায়ু বাড়িয়ে নেবার এই একটা কৌশল।' লেখাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম যে আমাদের এই আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ধরে রাখার পিছনে হয়তো এটাই মূল প্রেরণা। আর এই প্রেরণা থেকেই জন্ম নেয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, নাটক আর ছবি। অনেক সময় নিজেদের ভাবনা চিন্তা শুধু কলম বা তুলির আঁচড়ে ধরে রাখার থেকেও আর একটু বেশী চায় মন। মন চায় নিজের ভাব বা ভাবনা প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

'বাতায়ন সংকলন সংখ্যা'র প্রচেষ্টা সেই আদান প্রদানের জায়গাটি সুপ্রশস্ত করে তোলা। এই সংখ্যায় কিছু লেখা আমাদের আগের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু লেখা নতুন। আগে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা দিয়ে সাজান এই সংখ্যাটি আপনাদের ভাল লাগলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আপনাদের সহযোগিতা আর শুভেচ্ছাই আমাদের আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।

সকলে ভাল থাকবেন। সুস্থ মন আর শরীর নিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। নিজেরা সারস্বত সাধনা চালিয়ে যাবেন আর উৎসাহ দেবেন অন্যকেও এই আশা রইল।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়, শিকাগো, ইলিনয়

Journeys With Batayan

We hope you enjoy the mix of new and previously published pieces in this Batayan anthology.

Travel far and wide within these pages from the mossy Oregon woods of Dry Creek Falls to snowy Sikkim pass in the Himalayas. You can almost taste the cardamom of *Calcutta Cuisine* and catch glimpses of the elegant art of *Dokra* and *The Street Venders*.

Look deeper into the changes of everyday life and the love of family, friends and pets in *Ashray, A House Time Teller, Christmas* and *Sassy's Magic*. Writing crystallizes and preserves the memories and caring that sustain us.

Explore what makes a writer timeless in the translation of Rilke's *The Idiot's Song* and *400 Years of William Shakespeare*.

Batayan has opened many windows in my life and mind and introduced me to insightful people and beautiful places I could not visit otherwise. Thank you to all our writers and readers for sharing these stories. I look forward to many more journeys with *Batayan.*

Jill Charles
Editor, English Section

সূচীপত্র

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঃ ইতিহাস ও কিংবদন্তী ১
স্বপনকুমার ঠাকুর

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ ৭
সুজয় দত্ত

400 Years of William Shakespeare ১৩
Jill Charles

নাইদার নাইট নর ডে ১৫
ইন্দ্রানী দত্ত

Ashray, A House Time Teller…….. ২১
Indrani Mondal

মিলি ২৪
শাশ্বতী ভট্টাচার্য

গা ছুঁয়ে বলছি মাইরি ৩০
সুজয় দত্ত

হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছেগুলো ৩৯
ধীমান চক্রবর্তী

একদিন সব সত্যি ছিল ৩৯
ধীমান চক্রবর্তী

কবি প্রসঙ্গ ৪০
সেতারা হাসান

Dust If You Must ৪১
Kathy Powers

Sassy's Magic ৪১
Malina Damjanovic

A day in the life of America's Prime ৪২
Bianca Chatterjee

সংকলন

মেমসাহেবের দিন ৪৪
দেবীপ্রিয়া রায়

ফুটবল ৪৭
আলপনা গুহ

যদি ৪৯
শৈবাল তালুকদার

স্থানীয় ট্রেন ও জানালার ধার ৫০
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

উইদাউট আ প্রিফেস ৫২
ইন্দ্রানী দত্ত

স্মৃতি ৬০
বানী ভট্টাচার্য্য

যাবে তুমি ? ৬১
মহম্মদ শাহরিয়ার

ওঁ থেকে ও-মারিয়া ৬২
সুভাশীষ মুখার্জী

The Wind Pipe ৬৫
Abhijit Mukherjee

"তবু তুমি নেই" ৬৬
সুপর্ণা চ্যাটার্জী

The Street Venders ৬৭
Indrani Mondal

My Spoon ৬৮
Tinamaria Penn

Christmas, 2015 ৬৯
Viola Lee

গোরস্থানে হেমন্তের বিকেল ৭০
আনন্দ সেন

Calcutta Cuisine ৭১
Balarka Banerjee

লিমেরিক ৭৬
শুভ্র দত্ত

Amazing Art of Dokra ৭৭
Bishakha Dutta

Sikkim ৭৯
Shravani Datta

Oregon Travel Experience ৮৩
Saumen Chattopadhyay

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঃ ইতিহাস ও কিংবদন্তী

স্বপনকুমার ঠাকুর

আগনগর আগদিয়া কিম্বা হগদিয়া[১] - যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বুঝতে বাকি থাকে না এ হলো গিয়ে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার গঙ্গাপাড়ের অগ্রদ্বীপ। আঞ্চলিক স্থাননামের যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই একসূত্রে গেঁথে ফেলেন তিনটি নাম যথা কন্টকদ্বীপ মানে কাঁটাদিয়া অর্থাৎ একালের কাটোয়া। তারপর নবদ্বীপ। আর সেই সঙ্গে অগ্রদ্বীপ। ভাগীরথীর আশীর্বাদ অগ্রদ্বীপের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অভিশাপ ডেকে এনেছে। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাঘুরি করে আপাতত থিতু হয়েছে পূর্বতীরে। অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে জেলা বদলও হয়েছে। একসময় অগ্রদ্বীপ নদীয়া জেলার শুধুমাত্র একটি গ্রাম নয়; থানার মর্যাদা পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে অগ্রদ্বীপ পুনরায় বর্ধমান জেলা ভুক্ত হয়।

অবশ্য সুপ্রাচীন কাল থেকেই অগ্রদ্বীপ এক সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা পেয়েছিল। বৈদিক দেবতা বরুণ। ইনি জলদেবতা, মহাবলশালী। শঙ্খ স্ফটিকের মত শুভ্র হার তাঁর গলায়। মৎস্য আসনে উপবিষ্ট। ইনি আবার শুধু জলদেবতাও নন। শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি। চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যখন যুক্ত হয় তখন সেই তিথির নাম স্বাভাবিক ভাবেই বারুণী। জ্যোতিষীদের মতে এই বারুণী তিথিতে যদি গঙ্গা বা নদীতে স্নান করা যায় - উপহার দেওয়া যায় ফুল, ফল আর কাঁচা আম তাহলে চাই কি - শত সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে নদীস্নানের যে বিপুল পুণ্য তা একবারেই লাভ করবেন। এমন মওকা ছাড়ে কে ? সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই অগ্রদ্বীপে বারুণী স্নানের জন্য অসংখ্য পুণ্যার্থীর আগমন ঘটতো। বহু দূরদূরান্ত থেকে সন্তানহীনা রমণীরা আসতেন মা গঙ্গার কাছে সন্তানলাভের জন্য মানত করতে। কাটোয়ার মিশনারি উইলিয়ম কেরি দ্য জুনিয়ার বাবা ডঃ উইলিয়ম কেরিকে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ ৪ ঠা এপ্রিল লিখিত একটি চিঠিতে জানিয়েছেন এমনি এক মজার অভিজ্ঞতার কথা। অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত বারুণী মেলায়[২] দুই মা এসেছিলেন সন্তান বিসর্জন দিতে। যদিও তাদের স্বামীরা

সন্তান দুটিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছিল। "At a late festival at ugru-dweepa two unnatural mothers cast their children into the river, but the fathers more human, look them out again and paid a certain sum for their runsom to the Brahmains" (Bengal as a field of Mission page no 214) এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে রেভারেন্ড জেমস লঙের The banks of Bhagirathi শীর্ষক প্রবন্ধে। এদিকে নিকটবর্তী দাঁইহাট হয়ে উঠেছিল দেবী ইন্দ্রাণীর পীঠস্থান। আর অগ্রদ্বীপসহ কাটোয়া প্রাচীনকাল থেকেই গুপ্ত বারাণসীর মর্যাদা পেয়েছিল। চৈতন্যজীবনীকার জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলকাব্যে লিখেছেন ঃ

পূর্বে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট মনোহর
উত্তরে অজয় গঙ্গা
মধ্যে কাটোয়া গুপ্ত-বারাণসী
নৃত্যে নবরতা সঙ্গা

কিন্তু লক্ষ্য ছেড়ে মাঝে মাঝে উপলক্ষ্য বড়ো হয়ে ওঠে । ইতিহাসের গতি তখন উল্টোপথে । চৈতন্য সমকালীন পর্বে কেতুগ্রাম থানার কুলাই গ্রামের বল্লভ ঘোষের নয় ছেলের অন্যতম গোবিন্দ ঘোষের ভজনস্থল হয়ে ওঠে অগ্রদ্বীপ । মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসাবে তিন ভাই-এর বাসু-গোবিন্দ-মাধবের ভূমিকা প্রশ্নাতীত । পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় এই তিন ভাই এর মধুর কণ্ঠে কীর্তনগান শুনে ও শ্রীখোলের দক্ষ বাজনার তালে বিভোর হয়ে তাঁরা নৃত্য করতেন । বাসু ঘোষ প্রথমে কুলাই পরে তমলুকে শ্রীপাট স্থাপন করেন, মাধবের সাধনক্ষেত্র হয়ে ওঠে ইন্দ্রাণী - দাঁইহাট । আর গোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ । তথায় মহাপ্রভু-নিত্যানন্দের আদেশে গোবিন্দ গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাধন ভজনে মগ্ন হন । গোবিন্দের দেহান্ত হলে মন্দির সন্নিকটে তাঁর নশ্বর দেহটি সমাধিস্থ করে পারলৌকিক ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় তাঁর আরাধ্য গোপীনাথের মধ্যস্থতায় । সে এক মধুময় প্রেমালেখ্য ! প্রতি বছরেই চৈত্র একাদশীতিথিতে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধবাসরে গোপীনাথ বিগ্রহটিকে কাছা পরিয়ে ও কুশাঙ্গরীয় ধারণ করিয়ে তাঁর মাধ্যমে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিস্পন্ন হয় । এ নিয়ে বিস্তারিত বলার অবকাশ এখানে নেই । শুধু এই তথ্যটুকু জানানো প্রয়োজন - ব্রজের গোপী কলাবতী, চৌষী মহান্তের অন্যতম গোবিন্দ ঘোষের জন্মতিথি জানা না গেলেও তাঁর তিরোভাব তিথি এই কৃষ্ণ একাদশীতে । এ এক আশ্চর্য সমাপতন । আর তারপর থেকেই বারুণী উৎসব ধীরে ধীরে রুপান্তরিত হয় ঘোষঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে । ভক্তিবাদীরা বলেন - এসবের মূলে নাটের গুরু ঐ রহস্যময় গোপীনাথ । সোয়া দু-ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কষ্টিপাথরের তৈরি অপূর্ব কৃষ্ণবিগ্রহ । অনেকেই বলেন দাঁইহাটের ভাস্কর্য শিল্পের আদি নমুনা । ত্রিভঙ্গিমঠামে দন্ডায়মান বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ । প্রত্নতত্ত্ব-বিদদের মতে খ্রীষ্টিয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ গোপীনাথ, উড়িষ্যায় ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে । প্রাক চৈতন্যযুগে কৃষ্ণের এই মূর্তি বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যতম আরাধ্য বিগ্রহ । শ্রীখন্ডের নরহরি সরকারের বাবা নারায়ণ দাস ছিলেন গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের গৃহচিকিৎসক । ইনি শ্রীখন্ডে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । গোপীনাথের সঙ্গে অষ্টধাতুর রাধা বিগ্রহের সংযোজন হাল আমলের ঘটনা । অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বৈষ্ণব পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর এক পন্ডিতি বিচার সভায় বৈষ্ণবধর্মের স্বকীয়া মতবাদকে হারিয়ে দিয়ে পরকীয়াবাদকে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গোপীনাথের সঙ্গে রাধার সংযুক্তি ঘটতে থাকে । অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের সঙ্গে রাধার সংযোজন সেই এক ঘটনার অনুসৃতি । অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ শুধু ভক্তের ভগবানই নন; নিরুপম ভাস্কর্যশিল্পের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবার কারণে যুগে যুগে অনেকেই গোপীনাথের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন । ইন্দ্রাণীর কবি মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসের অনুজ গদাধর দাস ইন্দ্রাণীর সিঙ্গিগ্রামের বাস চুকিয়ে উড়িষ্যাবাসী হয়েছিলেন । সেখানেই লিখেছিলেন জগৎমঙ্গল বা জগন্নাথমঙ্গলকাব্য ।

গোবিন্দ ঘোষের সমাধিস্থল

কিন্তু আত্মপরিচয়ে নিজের ঠিকানা দিয়েছেন ।

অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রাই পদতলে
আমার নিবাস সেই চরণ-কমলে ।।

ইতিহাস, কিংবদন্তী জনশ্রুতিতে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল । এসব কাহিনীগুলি[৩] অনুধাবন করলে মনে হবে তিনিই যেন এক জীবন্ত সত্ত্বা । রহস্যময় ।

অগ্রদ্বীপে দত্তবংশীয় জমিদার সহস্রাক্ষ এক আদর্শ জমিদার হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন । অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন কুলদেবতা কৃষ্ণদেব । ইনিও গোপীনাথ সদৃশ বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ । বর্তমানে শেওড়াফুলি রাজবংশের

পাটুলির রাজাদের কুলদেবতা কৃষ্ণদেব

তত্ত্বাবধানে নিস্তারিণী মন্দিরে রয়েছেন। সহস্রাক্ষের মৃত্যুর পর অগ্রদ্বীপ গঙ্গায় গ্রাস করলে তাঁর পুত্র উদয় পাটুলিতে রাজ্যপাট স্থাপন করেন।

ইতিমধ্যে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হয়ে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। দেওয়ান কার্তিকেয় রায়ের লেখা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত থেকে জানা যায় রাজা মানসিংহ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দর্শন করে প্রভূত ভূসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। গোবিন্দ ঘোষের প্রয়াণের পর গোপীনাথের অধিকার নিয়ে তাঁর বংশধরদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা। পূর্ববঙ্গস্থিত বংশধরেরা একসময় জোর করে গোপীনাথ হরণ করে নিয়ে যান। অগ্রদ্বীপের ভক্তদের কাতর অনুরোধে পাটুলির তৎকালীন রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে গোপীনাথ ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। তবে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথকে না রেখে পাটুলির মন্দিরে কৃষ্ণদেবের পাশে রেখে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু মাত্র চৈত্রমাসের বারুণী উৎসবে গোপীনাথ যেতেন অগ্রদ্বীপে। এই ঘটনাটি ঠিক কোন সময়ে ঘটেছিল এবং পাটুলির কোন রাজার নেতৃত্বে গোপীনাথকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু গোপীনাথ বড়ো চঞ্চল। এক স্থানে তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। তখন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল। অগ্রদ্বীপের মেলা মানে লোকে লোকারণ্য। একবার সেই মেলায় ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাঁধে। কয়েক জন লোক মারাও যায়। প্রচুর লোক হয় আহত। ক্রুদ্ধ নবাব এর কারণ জানতে তলব করলেন সংশ্লিষ্ট সকলকে। বর্ধমান, নদিয়া, পাটুলির রাজপ্রতিনিধিরা তখন নবাব সমীপে দন্ডায়মান। বিরক্ত নবাব জিজ্ঞাসা করলেন - অগ্রদ্বীপ কার অধীনে ? বর্ধমানের উকিল বললেন - অগ্রদ্বীপ বর্ধমান রাজ্যের অন্তর্গত নয়। ভীত সন্ত্রস্ত পাটুলির উকিল মৌন হয়ে থাকাই নবাবের রাগ থেকে বাঁচার পথ ভাবলেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির চতুর উকিল উপস্থিত বুদ্ধির সঙ্গে বললেন . . . আজ্ঞে ! নবাব বাহাদুর। অগ্রদ্বীপ কৃষ্ণনগরের রাজার ''শাসনাধীন গ্রাম। মেলায় যা জনসংখ্যা হয়েছিল আমার প্রভু অধিকতর সতর্ক থাকায় সেই তুলনায় প্রাণহানি কম হয়েছিল জাঁহাপনা।'' বেশ। ''ভবিষ্যতে যেন এমনটি আর না হয়। আরও সতর্ক থাকবেন।'' এইভাবে বাজি জিতলেন কৃষ্ণনগরের উকিল। গোপীনাথ এবার থেকে কৃষ্ণনগরের রাজা রঘুরামের সম্পত্তি হয়ে উঠলেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কাটোয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় রঘুরাম গোপীনাথ লাভ করার ফলে এমনি আনন্দিত হয়েছিলেন যে কুষ্ঠিয়ার কয়েকটি গ্রাম তিনি গোপীনাথের নামে দেবোত্তর করে দেন। এমনকি কুষ্ঠিয়ার নাম পরিবর্তন করে গোপীনাথপুর রাখেন।

রঘুর পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপীনাথের জন্য এক অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করেণ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। সেই মন্দিরের কথা আছে কবি বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গলকাব্যে।

অগ্রদ্বীপে আসি নৌকা হৈল উপস্থিত।
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব নির্মাণ বাটি দেখিয়া সুন্দর।

মন্দির কেমন ছিল সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মেলে ১৮১৫ সালে প্রকাশিত খ্রীস্টান মিশনারি ওয়ার্ড সাহেবের লেখা 'The Hindu' গ্রন্থে। মুল মন্দির ছাড়াও আরও পাঁচটি কক্ষ ছিল। একটি ভোগঘর, বাসন-পত্র রাখার ঘর, ভান্ডারঘর। এছাড়া মন্দির সংলগ্ন দুটি বৃহৎ কক্ষ ছিল

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত মন্দির
সীতারামের আঁকা চিত্র (১৯ শতক)

দূরের যাত্রীদের জন্য । ওয়ার্ড সাহেব লিখেছিলেন "At Ugra-deepa the temple of Gopinath has different houses attach to it; One for cooking; another for utensils used in worship; another is a store house for the offerings and two others are open rooms for the accommodation of visitors and devotees" (page no 123) । বোঝাই যায় গোপীনাথের কী রাজকীয় সেবা তখন চালু হয়েছিল । ওয়ার্ড সাহেবের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে নদীয়ারাজ গোপীনাথের সেবার জন্য প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র নির্মিত এই মন্দিরের দুটি চিত্রের সন্ধানও সম্প্রতি পেয়েছি । প্রথম ছবিটি আঁকেন মুর্শিদাবাদ ঘরাণার বিস্মৃত বাঙালী চিত্রকর সীতারাম । বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রশাসনিক কাজে ১৮১৪ সালের ২৮ জুন ২২০টি নৌকা নিয়ে গঙ্গাপথে কলকাতা থেকে পাঞ্জাব গিয়েছিলেন । সঙ্গে ছিলেন প্রিয়শিল্পী সীতারাম । ইনি যাত্রাপথের দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির ছবি আঁকেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রদ্বীপের এই মন্দির । ছবিটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে । ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার ধার ঘেঁষে মন্দিরগুচ্ছের বিপজ্জনক অবস্থান । প্রথমেই নজরে পড়ে মন্দিরের প্রবেশতোরণ । তারপর সুবৃহৎ একচালা মন্দির । সম্ভবত এটিই গোপীনাথের মন্দির । গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র বা কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণরাইয়ের মন্দিরের মতো বৃহৎ ও চাকচিক্যময় । পাশেই রয়েছে একতালা একটি দালানবাটি । এটিই মনে হয় ওয়ার্ডসাহেব উল্লেখিত যাত্রীনিবাস । লাগোয়া দ্বিতল দালানটি নাটমন্দির । ছবিটি আঁকা হয়েছিল ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । সীতারামের সমসাময়িক ব্রিটিশ চিত্রকর D'Oylys সাহেব প্রবল বন্যায় গোপীনাথমন্দিরের ছবি এঁকেছিলেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে । ছবিটির পরিচিতি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "Aghadeep was then in the Burdwan district on the west bank of the river with large fair" - Aug 1820 । যাইহোক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের মন্দির থেকে বাৎসরিক ২০ হাজার টাকা আয় করতেন । বোঝাই যায় গোপীনাথ নিয়ে তৎকালীন জমিদারদের মধ্যে কেন এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল । সেটা যতখানি না ভক্তির বিষয় তার থেকেও বড়ো ছিল আর্থিক বা মান সম্মানের । রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পড়তি সময়ে গোপীনাথ হরণ করেন কলকাতার উঠতি রাজা নবকৃষ্ণ দেব । সে এক মজার ইতিহাস । পূর্বোক্ত তীর্থমঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের বাবা অগ্রদ্বীপের মন্দির দেখলেও গোপীনাথ দর্শন করতে না পেরে হতাশ হয়েছিলেন । কেননা - -

রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ ।
দর্শন না প্যায়া যাত্রী মাথে মারে ঘাত ।

রাজা নবকৃষ্ণ সে যুগে বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি । এক সময় রবার্ট ক্লাইভের মুন্সি । ১৭৬৬ খ্রী নবকৃষ্ণ মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হন । ১৭৭৬ খ্রী ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল পদে উত্তীর্ণ হলে নবকৃষ্ণ সৌভাগ্যের স্বর্গলোকে পৌঁছে যান । বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা গৃহদেবতা গোবিন্দজী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে একরকম জোর করে হরণ করে নিয়ে আসেন কলকাতার শোভাবাজারে ১১৭৫ বঙ্গাব্দে । এর ঠিক দু বছর পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মামলায় জিতে গোপীনাথ বিগ্রহ

শোভাবাজারের গোপীনাথ

ফেরৎ পান । শোভাবাজার রাজবাড়ির সপ্তম প্রজন্মের বর্তমান বর্ষীয়ান উত্তরসূরি অলোককৃষ্ণ দেব শুনিয়েছেন অন্য এক গল্প । পলাশির যুদ্ধের বিজয় উৎসব নাকি পালিত হয়েছিল শোভাবাজার রাজবাড়িতে । সেই উপলক্ষে তৎকালীন বঙ্গের বিখ্যাত কৃষ্ণবিগ্রহগুলি আনা হয়েছিল যেমন খড়দহের শ্যামসুন্দর, বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, সাইবানার নন্দদুলাল, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন এবং অগ্রদ্বীপের গোপীনাথজীকে । বিষ্ণুপুরের মদনমোহন স্বয়ং কামান দেগেছিলেন বর্গিহাঙ্গামার নায়ক কুখ্যাত ভাস্কর পন্ডিতের বিরুদ্ধে । এই ছিল লোকবিশ্বাস । চৈতন্য পরিকর কাশীশ্বরের ভাগ্নে রুদ্ররাম নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বল্লভপুরের রাধাবল্লভকে । মেঝভাগ্নে রামরাম খড়দহে স্থাপন করেন বিখ্যাত শ্যামসুন্দরকে আর ছোট ভাগ্নে লক্ষণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাইবেনের নন্দদুলালকে । আবার অনেকের মতে এই তিন বিখ্যাত মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ তনয় বীরভদ্র । সে যুগে বিশ্বাস ছিল এই তিন মূর্তিকে দর্শন করলে আর পুণর্জন্ম হয় না । পরন্তু এই তিন মূর্তিকে দেখলে নাকি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎ হয় । এদিকে গোপীনাথ হলেন ভক্তের ভগবান । সুতরাং এই বিখ্যাত মূর্তিগুলি শোভাবাজার

রাজা নবকৃষ্ণ

রাজবাড়িতে এনে জাঁকজমকের সঙ্গে দেবসেবার আয়োজন করে নবকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষমতা কাকে বলে । উৎসব সমাপ্তিতে অন্যান্য বিগ্রহগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় ফিরিয়ে দিয়ে এলেও অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে শোভাবাজারেই রেখে দেওয়া হয় । রাজা নবকৃষ্ণ নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন . . . . গোপীনাথ আর অগ্রদ্বীপে ফিরে যেতে চান না । সেই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের কাছে তিন লাখ টাকা ধার করেছিলেন । নবকৃষ্ণ জানালেন ঐ টাকা তাঁকে আর শোধ করতে হবে না । বিনিময়ে গোপীনাথ শোভাবাজারেই থাকবেন । বলা বাহুল্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে এ নিয়ে মামলা দায়ের করেন । সে মামলার রায় হলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে গোপীনাথ ফেরৎ দিতে হবে । নবকৃষ্ণ এবার একটি মোক্ষম চাল দিলেন । অতি গোপনে এ কি রকমের দেখতে আর একটি গোপীনাথমূর্তি বানিয়ে নিয়ে আসল নকল একাকার করে দিলেন । ঘোষণা করলেন - যেটি অগ্রদ্বীপের সেটি আপনারা নিয়ে যান । কৃষ্ণচন্দ্র পড়লেন মহা ফাঁপরে । রাজ পুরোহিত জানালেন - চিন্তার কিছু নেই । গোপীনাথ আমাকে স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছেন কোনটি আসল । এদিকে শোভাবাজারের তরফ থেকে দাবি করা হয় অরিজিনাল গোপীনাথই তাঁদের বাড়িতে রয়েছেন । ২০১২ সালের ৩রা মে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে অলোককৃষ্ণ দেব বলেছিলেন - "There is no records of which idol was taken back, we assume Nabakrishna was clever enough to have retained the original".

আজও রাজবাড়িতে গোপীনাথের নিত্য পুজো সেবা হয়ে চলেছে । গোপীনাথের বাৎসরিক জন্মতিথি পালিত হয় বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে । সেদিন জাঁকজমক সহকারে রাজকীয় ভাবে গোপীনাথ আরাধনা হয় । প্রসঙ্গত - রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও দেবসেবা বিভাজিত হয়েছিল দুই সন্তানের মধ্যে । দত্তকপুত্র গোপীমোহন পেয়েছিলেন গোবিন্দজী বিগ্রহ । আর নিজ ঔরসজাত সন্তান রাজকৃষ্ণ নিয়েছিলেন প্রিয় গোপীনাথজীর সেবা ।

স্বয়ং গোপীনাথের আসল-নকল নির্ণয় করা কার সাধ্য । শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি আসল গোপীনাথ বুঝতে তান্ত্রিক হস্তলিপির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথে নাকি ভেজাল নেই । যাইহোক সেই তর্কে যাচ্ছি না । আপাতত নাটের গুরু গোপীনাথ এখন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে অগ্রদ্বীপেই রয়েছেন, তবে কতদিন থাকবেন বলা বড় দুস্কর !!!

তথ্য বিস্তার ঃ

১) ১৬৬০ খ্রী ভান ডেন ব্রুকের ম্যাপে দেখা যায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে গ্যাসিয়া অর্থাৎ গাজিপুর আর পূর্বতীরে হগদিয়া অর্থাৎ অগ্রদ্বীপ । ১৭৭৯ খ্রী জেমসের রেনেলের ম্যাপেও অগ্রদ্বীপের অবস্থান একই । ১৮০৬ খ্রী হেনরি মার্টিন অগ্রদ্বীপকে গঙ্গার বামতীরে দেখলেও ১৮৮৬ খ্রী জেমস লঙ দেখেছেন গঙ্গার ডানতীরে । আবার শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত কাটোয়ার ইতিহাস রচয়িতা নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন অগ্রদ্বীপের ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলেন তখন তার অবস্থান গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে । টলেমির মানচিত্রে চিহ্নিত আগনগরকে ম্যাক্রিন্ডল, সেন্ট মার্টিন উইলফোর্ড প্রমুখরা অগ্রদ্বীপ বা আগনগর রূপে দেখেছেন । অষ্টাদশ শতকের প্রথামার্ধে রচিত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে অগ্রদ্বীপ আগদীয়া রূপে উল্লেখিত ।

২) অগ্রদ্বীপের বারুণীমেলায় লক্ষাধিক জনসমাগম হতো । কাটোয়ায় ১৮০৪ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখানে মিশনারিরা খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার করতে আসতেন । জেশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড সাহেব জুনিয়ার দ্য কেরি, রেভরেন্ড চেম্বারলিন প্রমুখরা । এনাদের রচনা থেকে জানা যায় অগ্রদ্বীপের মেলা সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য । যেমন মেলায় দেহপসারিণীদের ভিড়, নানা বৈষ্ণব গোষ্ঠী - উপগোষ্ঠীদের ভিড় ও কার্যকলাপ । বাংলায় সন্ন্যাস বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল এই মেলা ।

৩) ওয়ার্ড সাহেব অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তৎকালীন প্রচলিত একটি জনশ্রুতির বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে one night a stranger came to the temple (Agrodweep Gopinath Temple) at a very late hour, when no one was awake to give him refreshment. The God himself however in the form of Ghosh Thakur took an ornament from his ancle and purchased some food for the stranger at an adjoining shop. In the morning there was a great noise in the town about this ornament, when the shopkeeper and the stranger declared these facts, so creditable to the benevolence of the God, and from these circumstance the fame of Gopinath spread still wider …. A view of the History, Literature and Religion of the Hindoos W. Ward Voll 2 Serampore 1815 page no 162.

ড: স্বপন কুমার ঠাকুর পেশায় বর্ধমান জেলার দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক, নেশায় আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্র-গবেষক । ''ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর কাটোয়া মহাকুমার লোক জীবন ও লোক সংস্কৃতি'' বিষয়ের ওপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন । রচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা গ্রন্থ ও মৌলিক নিবন্ধ । আঞ্চলিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী ''কৌলাল'' পত্রিকার সম্পাদক ।

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ

সুজয় দত্ত

রবীন্দ্রনাথ আমার শয়নে-স্বপনে-ঘুমে-জাগরণে – এই কথাটা আমি অন্ততঃ বাংলা অনার্সের ছাত্রের মতো কাব্যি করে বা রূপকার্থে বলতে পারব না। কারণ ওটা ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনে হাড়ে হাড়ে সত্যি। 'শয়নে', যেহেতু আমার তিন বছর শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে আসা আপাদমস্তক রবীন্দ্রভক্ত দাদুর রেক্সিন-বাঁধানো সঞ্চয়িতা আর গীতবিতান বইদুটো আমি মাঝেমাঝেই বালিশ করে শুতাম। আমি বলেই বোধহয় দাদু কখনো কিছু বলেননি। 'ঘুমে', কারণ সেই ঘনঘন লোডশেডিং-এর অন্ধকার, গুমোট রাতগুলোয় যখন মাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, গার্লস্ হাইস্কুলের ক্লাস টেনের বাংলার টীচার তখন তাঁর পেশাগত অভ্যাসেই সম্ভবতঃ মাধ্যমিকের সিলেবাস থেকে মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' আউড়ে আমাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতেন। আর ছোট্ট আমি 'রক্ত', 'অন্ধ', 'নিঃশ্বাস হরণ' এসব শুনে পুরোটা না বুঝেই ভয়ে বলে উঠতাম, 'না না, ওটা না, ওটা না।' তখন মা নরম গলায় শুরু করত, 'দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে/ আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।' আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমের দেশে। 'জাগরণে', কারণ জেগে থাকলে আমাদের সাবেকী আমলের কড়িবর্গা দেওয়া একতলা বাড়ীর বৈঠকখানায়, বারান্দায় আর দাদুর শোবার ঘরে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পোজের পোর্ট্রেট আর স্কেচ্গুলো চোখে পড়তই সবসময়। ও হ্যাঁ, 'স্বপনে'টা বাদ গেল, তাই না? তা ঐরকম রবীন্দ্রময় পরিবেশে (অন্ততঃ দাদু বেঁচে থাকাকালীন তাই ছিল) মাঝেসাঝে ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে নিয়ে যে দু-একটা স্বপ্ন দেখিনি – এমন গ্যারান্টি দিতে পারিনা।

রবীন্দ্রনাথ বললেই সবার হয়তো মনে হয় বিশ্বকবি হিসেবে সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা বা বিশ্বভারতীর কথা। আর আমার মনে হয় বিশু-দার কথা। বিশ্বজীবন দে। প্রাইমারী স্কুলে আমার চেয়ে দু-ক্লাস উঁচুতে পড়ত, পরে হাইস্কুলে ব্যবধানটা দাঁড়ায় একক্লাস (কারণটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবেনা!)। উচ্চমধ্যবিত্ত, সংস্কৃতিবান পরিবারের ছেলে। বাড়ীতে গানবাজনার চর্চা ছিল বলেই বোধহয় না শিখেও গানের মোটামুটি গলা। টিফিনের সময় হাইবেঞ্চের ওপর বসে ডেস্কে তবলা বাজিয়ে 'কিস্সোরকুমার' যখন ধরত, চারপাশে ছেলেরা গোল হয়ে বসে শুনত। অবশ্য ওর মধ্যমণি হবার আরো একটা কারণ ছিল। ওর মায়ের হাতের কুচো চিংড়ির বড়া আর চিংড়ির মালাইকারী ছিল – কী বলব – স্বর্গীয়। সেসব ও মাঝেমাঝেই টিফিন ক্যারিয়ারে করে স্কুলে নিয়ে আসত আর গানের পরে শ্রোতাদের সেটা হত উপরি পাওনা। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের স্মৃতিতেও চিংড়ি জড়িয়ে আছে – একটু অন্যভাবে। ও তখন ক্লাস ফাইভে, আমি থ্রি-তে। মর্নিং স্কুলে সক্কালবেলা সবাইকে মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে আগে প্রেয়ার হত, তারপর অন্য কথা। 'হও ধরমেতে ধীর', 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'বল বল বল সবে', ইত্যাদি। বিশু-দার স্ট্র্যাটেজি ছিল লাইনের একদম পিছন দিকে স্কুলের দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো আর গান দু-চার কলি এগোতে না এগোতেই দিদিমণিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে টুক করে কেটে পড়া। আমি তখনো ওর নাম জানতাম না, কারণ মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম। যেদিন 'জনগণ মন অধিনায়ক' গাওয়া হয়, সেদিন কিন্তু ও পালায় না। গম্ভীর মুখে চোখ বন্ধ করে শেষ অবধি দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লাস ফাইভের ফার্স্টবয় শ্যামসুন্দরদা (যাকে হাই পাওয়ারের চশমা আর দারুণ রেজাল্টের জন্য সবাই চিনত) একদিন জিজ্ঞেস করল, 'কিরে বিশু, ঐ গানটায় অত ভক্তি কিসের?' বিশু-দার উত্তরটা আজও মনে আছে, কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওরকম ব্যাখ্যা আর কখনো কারো মুখে শুনিনি। 'জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে'র 'মঙ্গলদা' কথাটা শুনলেই নাকি ওর মনে গলদা চিংড়ির ছবি ভেসে ওঠে, যা ওর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। জিভে জল এসে যায়। স্রেফ সেই আকর্ষণেই নাকি –

যাইহোক, এহেন বিশু-দা প্রতি শনিবার লাস্ট পিরিয়ডে গানের ক্লাসে অপরিহার্য লীড সিঙ্গার ছিল। কালো ফ্রেমের চশমা পরা গম্ভীর চেহারার গানের টিচার বীথিদির সুনজরেও ছিল। শুধু একটা জিনিস ছাড়া – যার জন্য ভদ্রমহিলা ওর ওপর মাঝে মাঝে তিতিবিরক্ত হয়ে যেতেন। গলায় সুর থাকলেও গানের কথা মনে রাখার ধৈর্য্য বা ইচ্ছে – কোনোটাই ওর ছিলনা। অবশ্য শুধু গান নয়, অন্য যেকোনো বিষয়েই ওর একই অবস্থা। মুখস্থ করা ওর ধাতে সইত না। ওদের ভূগোল পড়াতেন লতিকাদি, তাঁর ক্লাসে একবার এক কান্ড করেছিল। এমনিতেই বানান নিয়ে বিশু-দার চিরকালীন সমস্যা, হাফ্ ইয়ার্লি পরীক্ষায় বারকয়েক নর্মদানদীকে 'নর্দমানদী' লেখায় ক্লাসে খাতা বেরনোর দিন একপ্রস্থ কড়কানি খেয়েছিল। কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষায় যা করল, ওটা তার কাছে কিছুই নয়। প্রশ্ন ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে সাড়ে বাইশ ডিগ্রী অক্ষরেখাকে কী বলা হয়। এখন ওর তো গেছে মুখস্থ গুলিয়ে। পরীক্ষার হলে খানিক উশখুশ করল,

আশপাশের লোকজনকে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল, শেষে হাল ছেড়ে দিল। পরীক্ষা-শেষে যখন সবাই জানতে চাইল, 'কিরে বিশু, ওটা ছেড়ে এলি নাকি ?', ও বলল মোটেই ছাড়েনি, কায়দা করে উত্তর দিয়েছে। টীচার কিছুতেই গোল্লা দিতে পারবে না। কায়দাখানা কী ? কর্কটক্রান্তি না মকরক্রান্তি - এই নিয়ে তো সংশয়। ও দুটোর অ্যাভারেজ করে লিখেছে 'মর্কটক্রান্তি' !

এই যার ট্র্যাক্ রেকর্ড, সে সিরিয়াস রবীন্দ্রসঙ্গীতের কঠিন কঠিন লাইন ঠিকঠাক মনে রাখতে পারবে – বীথিদির এই আশাটাই ছিল অবাস্তব। একবার কী হয়েছে বলি। বিশ্ব-দা তখন ক্লাস সিক্সে গাড্ডা খেয়ে রিপিট করছে। আমি ফাইভে। পয়লা বৈশাখের আগে তেড়ে প্র্যাক্টিস হচ্ছে 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি'। সমবেত কণ্ঠে। আর প্রায় প্রতিবারই শ্রীমান লীড্ সিঙ্গার আমাদের মিস্‌লীড করে গানের প্রথম অন্তরায় 'দীপের আলো ধূপের ধোঁয়া'কে বানিয়ে দিচ্ছে 'ধূপের আলো দীপের ধোঁয়া'। শুনে বীথিদির ঘন কালো ভুরুদুটো আরো কুঁচকে উঠচে, কপালে পড়ছে ভাঁজ। শেষে থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, 'হ্যাঁরে অ্যাই ছেলে, তোর বাড়ীতে কী একটা মোমবাতি বা হারিকেন্‌ও জোটেনা ? তুই কী ধূপের আলোয় লেখাপড়া করিস ?' যাইহোক সে-যাত্রা উতরে গেলেও মাসখানেক বাদে গরমের ছুটির ঠিক আগে রবীন্দ্রজয়ন্তীর ফাংশানে বিশ্ব-দা যে খেল দেখালো, এই বিশ্বেই তার তুলনা মেলা ভার। পরে শুনেছিলাম এই ঘটনায় স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য হারিয়ে বীথিদি টিচার্স রুমে ছুটে গিয়ে ওঁর সহকর্মীদের ধরে পড়েছিলেন, 'ওরে তোরা আর যাই করিস, বিশ্বকে এ-বছর ফেল করাস না, ওকে প্লীজ্ ক্লাস সেভেনে তুলে দিয়ে ডে-সেক্‌শনে চালান করে দে। নাহলে আবার পরের বছর ওকে নিয়ে গান –'। কী করেছিল বিশ্বদা ? সমবেতকণ্ঠে 'এদিন আজি কোন্ ঘরেগো' গাইতে গাইতে হঠাৎ 'কাহার অভিষেকের তরে'র পরের লাইনটা গেছে বেমালুম ভুলে। কিন্তু থামা তো চলবে না। তাই ওর বাবার কিনে আনা সলিল চৌধুরীর সুরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কির গানের' লং-প্লে রেকর্ড থেকে আধখানা লাইন দিল ঢুকিয়ে। একেবারে নিখুঁত প্লাস্টিক সার্জারি। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজের কানে ওকে গাইতে শুনতেন, 'কাহার অভিষেকের তরে শালিক নাচে ছাগল চরে', কী করতেন বলা মুশকিল ! হয়তো গলা থেকে নোবেল পদকটা খুলে এমন অসামান্য স্রষ্টাকে পরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমরা – মানে বিশ্বদার সহ-গায়করা – তো আর রবীন্দ্রনাথ নই। তাই হঠাৎ ওর মুখে কারো অভিষেকের এমন অভিনব বন্দোবস্তের কথা শুনে হকচকিয়ে গিয়ে গানই দিলাম থামিয়ে। ওদিকে তবলা আর হারমোনিয়াম বেজেই চলেছে। সে এক দৃশ্য ! জীবনে ভোলার নয়।

জীবন এরপর গড়িয়ে গেল বেশ কয়েক বছর। বৈদ্যুতিক বিনোদনের ভাষায় যাকে বলে 'ফাস্ট ফরোয়ার্ড'। আমি তখন বয়ঃসন্ধিতে। ক্লাস এইট। আমার মাসতুতো দিদি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। ইংরেজী-বাংলা-পল্ সায়েন্স কম্বিনেশন। কলকাতার যেকোনো কলেজে পড়াশোনার বাইরে যে-সমস্ত খেলা চলে, তার স্বাদ ও পেতে শুরু করেছে। ছাত্র-সংগঠনের ঝান্ডা নিয়ে পথে পথে মিছিল, সেই একই ঝান্ডাধারী কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের কারো কারো সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের নিরালায় বসে আন্ডাভাজা আর ঠান্ডা পানীয় খাওয়া – সবই চলছে প্রকাশ্যে অথবা লুকিয়ে। এমনিতে বাংলার চেয়ে ইংরেজী সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে ওর আগ্রহ বরাবরই একটু বেশী। আর ছোট থেকেই যথাসম্ভব কম পড়ে পরীক্ষায় যথাসম্ভব বেশী নম্বর পাওয়ায় ওর মনে কলেজজীবনেও এই আত্মবিশ্বাসটা কাজ করত যে ওর 'সাবানঘষা' মাথা – ফাঁকি দিলেও ক্ষতি নেই। আমার মেসোমশাই আবার পড়াশোনায় ফাঁকি একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। তো, আমার দিদির সেকেন্ড ইয়ারের বাংলা পরীক্ষার তখন সাতদিনও বাকী নেই। ওর তো যথারীতি প্রিপারেশন হয়নি, সকাল থেকে নিজের ঘরের বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে বসে নোট নিয়ে ঘেঁতিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছি মন বসছেনা। কেন বসছে না, সেটা বোঝার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি তখনো আমার হয়নি। সেটা ধরা পড়ল মেসোমশাইয়ের অভিজ্ঞ চোখে। 'ঘরে বাইরে' আর 'চার অধ্যায়ের' নোটের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে উনি রবিন কুকের রোমাঞ্চ উপন্যাস 'ভাইটাল্ সাইন্স্' পড়ছেন ! গোটা চারেক অধ্যায়ও বোধহয় শেষ করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে মেসোমশাইয়ের অগ্নিমূর্তির সামনে পড়তে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আর এক সৌম্যমূর্তি যুবকের প্রবেশ। গালে হাল্কা দাড়ি, সপ্রতিভ, মুখেচোখে ইন্টেলেকচুয়াল ভাব – যেন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এখুনি একটা লেক্‌চার দিতে পারে। অথচ পোশাক-আশাক বেশ সাধারণ। স্বপ্নীল-দাকে সেই আমার প্রথম দেখা। স্বপ্নীল দাশগুপ্ত। ঠিক কার সঙ্গে কী পরিচিতির ভিত্তিতে ও সেদিন ঐ বাড়ীতে এসেছিল, আমি বুঝিনি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই আমার মন জয় করেছিল – এটা বলতে পারি। মেসোমশাইয়ের মুখে দিদির কাহিনী শুনে হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল, 'কাকু, মিথ্যেই ওকে বকছেন। রবিন তো রবীন্দ্রনাথেরই অ্যাব্রিভিয়েশন্, আর কুক্ মানে রাঁধুনী অর্থাৎ ঠাকুর। ও তো পরীক্ষার প্রিপারেশনই করছে।'

এই স্বপ্নীলদার সঙ্গে আমার মাসতুতো দিদির ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে আরো ভাল করে আলাপ হল যখন, দেখলাম ওর ছাত্রসংগঠনের কাজে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আর কথাবার্তায় চালচলনে একটা অপ্রতিরোধ্য পপুলার অ্যাপীল ছাড়াও আরো কয়েকটা গুণ রয়েছে। দারুণ আবৃত্তির গলা আর কথায় কথায় লোককে হাসাতে পারার ক্ষমতা – নিজে গম্ভীর থেকে। অভিনয় খুব একটা ভাল না পারলেও মাথা থেকে এমন এমন সব স্কিটের

(অর্থাৎ অণুনাটিকার) আইডিয়া বার করত যে ওদের কলেজের নাটকের দলে ও ছিল অপরিহার্য । প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন 'মিলিউ' বলে একটা সাংস্কৃতিক সমাবেশ হত প্রতি বছর (এখনও হয়তো হয়) । বহু কলেজ অংশ নিত তাতে । সেই 'মিলিউ'র জন্য একবার ওরা 'শ্যামার' একটা আধুনিক সংস্করণ বানিয়েছিল । মানে গল্পের মূল কাঠামোটা ঠিক রেখে চরিত্রগুলোর মুখে আধুনিক সংলাপ আর বলিউডি-টলিউডি গান বসিয়ে দিয়েছিল । প্রেক্ষাপটটা বদলে করে দিয়েছিল আধুনিক । যেখানে শ্যামা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কলকাতার মিস্ শ্যামলিকা রায় আর বজ্রসেন, বোম্বের বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী মিঃ বজ্রমণি সেন, যিনি অনেকদিন লন্ডনে কাটিয়ে সবে কলকাতায় এসেছেন একটা কাজে । যেখানে মিঃ সেনকে স্বাগত জানাতে তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধু গেয়ে ওঠেন, 'বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত, দোস্তকো সেলাম করো' । যেখানে উত্তীয় (কলকাতার শিক্ষিত বেকার উত্তীয় মুখার্জী) তার প্রেমের চরম মূল্য দেওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করতে গেয়ে ওঠে মান্না দে-র 'শুধু একদিন ভালবাসা, মৃত্যু যে তারপর, তাও যদি পাই – আমি তাই চাই' । যেখানে শ্যামা বজ্রসেনকে হৃদয়ের অনুরাগ জানায় লতা মঙ্গেশকরের 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে' গেয়ে । দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটা, তুমুল হাততালি পেয়েছিল ওরা ।

কলকাতার কলেজ-জীবন নামক যে বস্তুটার স্বাদ আমার দিদি আর ভাবী জামাইবাবুকে বা চেনা-পরিচিত আর পাঁচটা তরুণ-তরুণীকে পেতে দেখেছি, তা আমার জীবনে একপ্রকার অনাস্বাদিতই রয়ে গেল । কেমন করে, সেটা বলি । দিদি ওর স্নাতকপর্বের পড়াশোনা শেষ করল আর আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম একঝাঁক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে । পরীক্ষা বলে পরীক্ষা – একেবারে অগ্নিপরীক্ষা ! একদিকে উচ্চমাধ্যমিক, অন্যদিকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স । আমরা নাম দিয়েছিলাম 'উমা' আর 'জয়ন্ত' । যেন দুই অভিমানী প্রেমিক-প্রেমিকা – কিছুতেই দুজনকে একসঙ্গে খুশী করা যায়না । একে একটু বেশী তদ্বির করতে গেলে ওর গোঁসা হয়, আবার ওর পিছনে একটু বেশী সময় দিলে এ আসে চোখ রাঙিয়ে তেড়ে । তার ওপর আবার ইঁটের বোঝার মতো আই আই টি এন্ট্রান্স । বাড়ীর অনেকেই চায় আমার নিশানা হোক ডাক্তারী, কারণ বাবার বা মায়ের দিকের পরিবারের কেউ কখনো ওপথে হাঁটেনি । কিন্তু আমি বায়োলজি ল্যাবে যা সব কীর্তিকলাপের নমুনা দেখেছি – আরশোলা কেটে নাড়িভুঁড়ি বার করা, ব্যাঙের পেট চিরে পাকস্থলী আর ডিম্বাশয় বার করা, সর্বোপরি নিজের আঙুলে বারবার ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বার করা – এঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবলেই গা গুলোয় । এমনসময় একদিন বাবা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন তিনটে টিকিট নিয়ে । ললিতকলা অ্যাকাডেমীর মঞ্চে একই সন্ধ্যায় সুচিত্রা-অমিতা । অর্থাৎ সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অমিতা দত্তের রবীন্দ্রনাথের থিম্ নিয়েই কত্থক নাচ । দেখলাম অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোক্তা স্পিকম্যাকে আর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্স্টিটিউট – আই এস্ আই । সেটা আবার কী বস্তু ! স্ট্যাটিস্টিক্স – তার আবার ইন্স্টিটিউট ? সে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বা অনুষ্ঠান করছে কেন ? স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে তখনো অবধি কেবল টেস্ট ক্রিকেটে আর একদিনের ম্যাচে কে কত রান করল বা উইকেট নিল – তাই বুঝতাম । হ্যাঁ, আমার চেয়ে বছর সাতেকের বড় জ্যাঠতুতো দাদার পড়ার টেবিলে 'স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোব্যাবিলিটি' বলে একটা ছেঁড়াছেঁড়া মলাটের বই দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তার ওপর জমে থাকা ধুলোই বলে দেয় ও নিজে সেটা কতবার খুলে দেখেছে । আর 'আই এস্ আই' মার্কা ছাপ তো দোকানে বাজারে বিভিন্ন জিনিসের গায়ে দেখা যায় – সেই ছাপ মারাই ঐ ইন্স্টিটিউটের কাজ বুঝি ? মোদ্দা কথা, আই এস্ আই শুনে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল, ওটা খায় না মাথায় দেয় ? কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখলাম আমার স্কুলের দুই অংকের টীচার আই এস্ আই-এর নামে গদগদ ! ওরকম জায়গা নাকি আর হয় না । বাবাকে বোঝালেন, 'মিস্টার দত্ত, ও আর যা যা পরীক্ষা দিচ্ছে দিক, কিন্তু আই এস্ আই এন্ট্রান্সে যেন অবশ্যই বসে' । ব্যাস, মিস্টার দত্তও সঙ্গে সঙ্গে আমার বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপিয়ে দিলেন । নিজেই বরানগরে গিয়ে ফর্ম আর ইন্স্ট্রাক্শন বুকলেট এনে বললেন এপ্রিলে অন্য সব পরীক্ষা চুকেবুকে যাওয়ার পর তো বসে বসে ভেরেন্ডা ভাজব, তাই মে মাসে আর একটা বাড়তি পরীক্ষা দিতে আপত্তি কী । নাঃ, আপত্তি আর কী, কিন্তু এটার জন্য যে ছাই প্রস্তুতিও নেওয়া যায়না । প্রিপারেশন গাইড্, স্যাম্প্ল কোয়েশ্চেন বুক – কোনোকিছুই বাজারে নেই । সেসব ছাড়াই পরীক্ষায় বসলাম, অবাক হয়ে দেখলাম লিস্টে নাম উঠেছে ওপরের দিকে । ম্যাথ্ আর সায়েন্সের ওপর দু-দুখানা ইন্টারভিউ পেরিয়ে একেবারে ভর্তিই হয়ে গেলাম ওখানে –

বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা বা কে সি দাশের রসগোল্লার মতোই বিখ্যাত হল বি টি রোডের জ্যাম্ । পাউরুটিতে মাখিয়ে খাওয়ার জ্যাম্ নয়, অসহ্য গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থেকে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া ট্রাফিক জ্যাম্ । আমরা বলতাম 'মিক্সড্ ফ্রুট্স্ জ্যাম্', কারণ বিশাল বিশাল ট্রাক থেকে শুরু করে মিনি মারুতি, পাবলিক-প্রাইভেট বাস থেকে শুরু করে তিনচাকার টেম্পো বা হাতে টানা রিক্সা – কোনোকিছুই বাদ থাকত না তাতে । এই জ্যাম্ এবং তজ্জনিত কোলাহল ও অব্যবস্থার দরুণ ডান্লপ ব্রিজ আর বনহুগলী এলাকাটা সকাল-বিকেল নরক হয়ে থাকত । সেই নরকের মধ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্স্টিটিউটের ক্যাম্পাসটা ছিল যেন একখন্ড স্বর্গ । ঢুকলেই মন জুড়িয়ে যেত । গাছপালা-ঘেরা ছোটছোট

দিঘি, তাতে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, রাঙা সুরকির পায়ে-চলা পথ, মাঠের ধারে আমগাছের সারি – সবমিলিয়ে দাদুর পুরনো অ্যাল্‌বামে দেখা শান্তিনিকেতনের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন একটা হাল্কা মিল । 'উত্তরায়ণ', 'আম্রকুঞ্জ' ইত্যাদি নামগুলোও সেই কথাই আরো বেশী করে মনে করায় । এই মিলের কারণটা শুরুতে জানতাম না, ঢোকার পর বুঝলাম ইন্‌স্টিটিউটের আর তার প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস শুনে । প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ – যাঁকে সবাই তাঁর জীবদ্দশায় 'প্রোফেসর' বলে ডাকত – রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিবই শুধু ছিলেন না, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রাণী মহলানবীশ কবির বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন । আরো আবিষ্কার করলাম, স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুবিনয় রায় ও অর্ঘ্য সেন দীর্ঘদিন আই এস্ আই লাইব্রেরীতে কাজ করেছেন । কিন্তু এটা ভাবিনি যে রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমার হস্টেলের ঘর অবধি তাড়া করে যাবেন ! এই প্রথম বাড়ী ছেড়ে হস্টেলে থাকছি, তাই মা-বাবার তরফ থেকে এক সপ্তাহ অন্তর শনি-রবিবার বাড়ী যাওয়ার অনুরোধটা ফেলতে পারতাম না । হস্টেলে আমার ঠাঁই হয়েছিল দোতলার একটা ডাব্‌ল্ রুমে – রুম্‌মেট জ্যোতির্ময় বোস লা মার্টিনিয়ে ফর্ বয়েজ থেকে টেন্ প্লাস টু করে এসেছে । তেলে-জলে যাওবা মিশ খায়, আমি আর আমার রুম্‌মেট ততটুকুও না । এর আগে আমার জীবনে এরকম সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের একজনের সঙ্গে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা তো ছিলনা, তাই ওর তালে ঠিক তাল দিতে পারতাম না । আমি দিনে জাগি, রাতে ঘুমোই আর ও রাতে তাস খেলে, দিনে ক্লাস কামাই করে নাক ডাকায় । আমি সাধারণ মাছেভাতে বাঙালী – ও লাঞ্চের টেবিলে ভাতের বদলে নুড্‌ল্‌স্ খায় আর রাতে ওর কোন প্রবাসী আত্মীয়ের আনা মাইক্রোওয়েভেব্‌ল্ ডিনার প্যাক ('মাইক্রোওয়েভ্ ওভেন' কথাটা আমি ওর কাছেই প্রথম শুনি) । এইরকম আর কি । যাই হোক, যে শুক্র বা শনিবার আমি বাড়ী যেতাম, আমিই ঘরের দরজায় তালা দিয়ে যেতাম আর চাবিও থাকত আমার সঙ্গেই । কারণ ও প্রতি সপ্তাহান্তেই বাড়ী যেত, রওনা হত আমার আগে আর ফিরতও আমার পরে – সেই সোমবার সকালে । এক রবিবার সন্ধ্যের দিকে বাড়ী থেকে হস্টেলে ফিরে দেখি ঘরের দরজায় তালা তো নেইই, ছিটকিনিটাও ভাঙা ! কী ব্যাপার? এমনিতে আমাদের ঘরে চোরের নেবার মতো দামী কিছু ছিলনা – কয়েকটা বই, কয়েক পিস্ সাধারণ জামাকাপড় আর দুটো ক্যাসিও ক্যাল্‌কুলেটর । তাও, তালা ভাঙা দেখলে প্রথমে চুরির কথাই মনে হয় । ছুটলাম ওয়ার্ডেনকে জানাতে । কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হলনা । একটু পরেই শ্রীমান রুম্‌মেট তার স্যাঙাতদের নিয়ে টিভি লাউঞ্জ থেকে ফিরে সহাস্যে বলল, 'কী জুতানন্দ, ঘাবড়ে গিয়েচ্চিলে তো? রোব্‌বার বিকেলে ফিরলাম, দেখলাম তুই তখনো আসিস নি । ভাবলাম যাব্বাবা, এ দেখি আরেক কিচাইন । তাই মেসের রাঁধুনিদের কাছ থেকে শাবল, ছুরি-টুরি নিয়ে এসে –' । জুতানন্দ নামটা ওই আমাকে দিয়েছিল – shoe মানে জুতো আর joy হচ্ছে আনন্দ । অতঃপর সে-রাতে মেসে ডিনার টেবিলে যতজনকে পারে, 'ও অমুকদা, অ্যাই তমুক, শোন্ না কী হয়েছে' বলে আমার ঘাবড়ানোর কাহিনী শোনাতে লাগল । দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম, এতদিনে রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়' কথাটা উপলব্ধি করা গেল । জ্যোতির্ময় শুধু দুয়ারই ভাঙেনি, কাজটা করে এমন অনাবিল joy হয়েছে তার যে বলার নয় । ছিটকিনিটা নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে সারাতে হবেনা তো, তাই বোধহয় ।

আগে যে বলছিলাম আই এস্ আই-তে যাওরার দরুণ কলকাতার কলেজজীবন নামক বস্তুটার আস্বাদ পুরোপুরি পেলাম না, তার একটা কারণ ওখানে বেশীরভাগ লোকের অংকই জীবন আর জীবনই অংক । হস্টেলের ঘরের দরজার গায়ে চক দিয়ে অংক, লাউঞ্জে রাখা টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতার মার্জিনে অংক, খাবার টেবিলে হাতমোছার ন্যাপ্‌কিনে অংক । অন্য কারণটা হল (অন্ততঃ আমার সহপাঠীদের মতে) প্রতি বছরের প্রতিটা ব্যাচে ছেলেদের সংখ্যাধিক্য । আঠেরো-কুড়ি-বাইশজনের ব্যাচে বড়জোর দু-একজন মেয়ে । তাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু আসে-যায়নি ঠিকই, কিন্তু আমার আশপাশের কো-এড্ স্কুল থেকে আসা সহপাঠীদের মানসিক ছটফটানিটা বুঝতে পারতাম । সেন্ট জেভিয়ার্স, ডন্ বস্কো বা স্কটিশ চার্চে পড়ার সময় তারা যা করে অভ্যস্ত, সেসব করার সঙ্গিনী এখানে না পেয়ে ওদের বাধ্য হয়ে যেতে হত রাস্তার উল্টোদিকে বেসরকারী আবাসনের চত্বরে বা অল্প দূরের অনন্যা সিনেমায় – 'অর্নিথোলজির' জন্য । এই শব্দটাও ওদের অভিধান থেকেই নেওয়া । সুবিধাজনক ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে বিপরীত লিঙ্গের গতিবিধি লক্ষ্য করাটা ওদের কাছে দূরবীন দিয়ে রংবেরঙের পাখী দেখার মতোই । যাইহোক, সংখ্যায় কম বলেই আমাদের ব্যাচেলর্স্ আর মাস্টার্স্ প্রোগ্রামে যতজন ছাত্রী ছিল – অধিকাংশের নামেই নানা উড়ো রোম্যান্টিক গল্প বাতাসে ভেসে বেড়াত । আমাদের বয়েজ্ হস্টেলের বিভিন্ন ছেলেকে জড়িয়ে । তার কত শতাংশ সত্যি, সেটা খোঁজ নিইনি কখনো । একটা জুড়িকে নিয়ে অনেক গল্প তৈরী হলে তাকে আবার ওরা বলত 'সিরিয়াল' । কিছু কিছু সিরিয়ালের নায়কদের মহিলামহলে দারুণ জনপ্রিয়তার প্রমাণ মাঝেমধ্যেই মিলত, ওরাও সেটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করত না । কিন্তু একদিনের ঘটনায় বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । আমাদের দু-ব্যাচ পরে অনিমিখ বলে একজন ছিল, যে হস্টেলে খুব কমই থাকত – ওর নামে একটা ঘর থাকা সত্ত্বেও । পিওর ম্যাথে বেশ পরিষ্কার মাথা, রুচি-টুচিগুলো ক্লাসিকাল (ধ্রুপদসঙ্গীত শিখত), চেহারায় একটা পড়ুয়া-পড়ুয়া ভাব । একদিন মেসে রাতের খাওয়া খেয়ে টেব্‌ল্ টেনিস রুমে গিয়ে দেখি একটা জটলা চলছে, হাসিতে ফেটে

পড়ছে লোকজন। কী ব্যাপার ? যতটুকু বুঝলাম, তা হল এই। অনিমিখ হস্টেলে থাকলে রাতে খাওয়ার পর কোথায় যেন বেরিয়ে যায়, এটা অনেকেই লক্ষ্য করেছিল। আমরা ভাবতাম হয়তো ধোঁয়া-টোয়া টানার অভ্যেস আছে, তাই। দু-চারজন অতি-কৌতূহলী ছেলে এর মধ্যে অন্য কিছুর গন্ধ পেয়ে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের মতো চুপিচুপি ওর পিছু নিয়েছিল কয়েকদিন। সেটা ও টের পায়নি। তারা নাকি আবিষ্কার করেছে ও পুকুরপাড় দিয়ে স্টাফ্ কোয়ার্টার্সের পিছনের রাস্তাটা ধরে হস্টেল-চত্বরের একেবারে অন্য প্রান্তে লেডিজ্ হস্টেলে যায়, আর নিয়মমতো সেই বাড়ীর সদরদরজা রাতে বন্ধ থাকলেও কেউ একজন টুক করে দক্ষিণদিকের খিড়কি দরজাটা খুলে ওকে ঢুকিয়ে নেয়। 'কেউ একজন'টা কে – সে তথ্যও বেশ চাঞ্চল্যকর। আমার তিন বছরের জুনিয়র মালবিকা চ্যাটার্জীকে পড়া ছাড়া আর কোনো কিছুতে কখনো উৎসাহী মনে হয়নি। দারুণ মেধাবী ছাত্রী – প্রতি সেমিস্টারের শেষে অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স্ ওর বাঁধা। কিন্তু রাঁধে বলে কি চুল বাঁধতে নেই ? আমাদের শার্লক্ হোম্স্দের সে-কথা আর বোঝায় কে ? তারা আজ শুধু লুকিয়ে ওর পিছু নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, যে মুহূর্তে মালবিকা খিড়কি খুলে ওকে ঢোকাতে যাবে, ঝোপের আড়াল থেকে হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠেছে 'আজি দখিনদুয়ার খোলা, এসো হে এসো হে এসো হে'। বেচারা অনিমিখ। নির্বিরোধী ছেলেটার এই হেনস্থা মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না, কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে চমৎকৃত হলাম ! কবিগুরু তাঁর 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ়' গানটায় বলে গেছেন না, 'মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে' ? কী বলব একে – কাকতালীয় না স্বর্গ থেকে গুরুদেবের অদৃশ্য কলকাঠি নাড়া ? নাঃ, ভদ্রলোক যে দূরদর্শী এটা মানতেই হবে।

আমাদের হস্টেলের একতলায় একটা মিউজিক রুম্ ছিল। তাতে রেকর্ড বাজানোর টার্নটেব্ল্ আর ক্যাসেটপ্লেয়ার ছাড়াও ভারতীয় আর বিদেশী কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের খুব ভাল সংগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো তার মধ্যে থাকবেই। মুশকিল হল, বেশীরভাগ সময়েই সেটা সিনিয়রদের – মানে মাস্টার্স্ আর এম্ টেক্ ছাত্রদের – দখলে থাকত। আমরা ব্যাচেলর্স ডিগ্রীর ছাত্ররা প্রায় ঢুকতেই পেতাম না। একবার সেমিস্ট্রাল পরীক্ষার শেষে মে মাসের এক কালবৈশাখীর রাতে, যখন প্রায় সবাই গরমের ছুটিতে বাড়ী চলে যাওয়ায় হস্টেল প্রায় ফাঁকা, আমি ঐ ঘরে এক রাত কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। এবং প্রাণপণে সদ্ব্যবহার করেছিলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেশ কিছু লং-প্লে রেকর্ড ঘেঁটে গোটা পঁচিশেক গানের কটা ক্যাসেটে ডাব্ করে নিয়েছিলাম। বাড়ীতে শুনব বলে। সে-ক্যাসেট আজও, এই এত বছর পরেও আমার কাছে আছে। নষ্ট হয়নি। যাইহোক, সেই রাতে আমার দুই মারাঠী সহপাঠী রাজেন দাতার আর অভিজিৎ দেশকার ট্রেন রিজার্ভেশন না পেয়ে হস্টেলে আটকে থাকায় আমার সঙ্গে মিউজিক রুমেই ছিল। গানটান শুনছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা তো বোঝেনা, কিন্তু কয়েকটা গানের সুর শুনে মুগ্ধ। তারপর থেকে ওদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার আর গাওয়ার কী আগ্রহ ! আড্ডায়-জমায়েতে বা বছর-শেষের এডুকেশনাল ট্যুরে ট্রেনে-বাসে যেতে যেতে আমাদের গেয়ে শোনাবেই। এমনিতে ওরা কয়েকবছর কলকাতায় থাকার ফলে ভাঙা ভাঙা বাংলা আয়ত্ত করেছিল। হিন্দী আর বাংলার অদ্ভুত মিশেলে কথা বলত। যেমন 'লজ্জা করে না ?' আর 'শরম নেহি আতি ?' – এদুটো মিশিয়ে বলত 'লজ্জা না আসে ?'। 'লেকিন কিঁউ ?' আর 'কিন্তু কেন ?' – এদুটো মিশিয়ে 'লেকিন কেন ?'। এইরকম আরকি। যার ফলে ওদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের নমুনাগুলো হত মনে রাখার মতো। একবার যখন সবাই মিলে দিল্লী যাচ্ছি একটা ট্রেনিং-এর জন্য, চলন্ত কাল্কা মেলে গান ধরল, 'সুন্দোর ব্যাটা তোর আঙোটখানি, তাড়াই তাড়াই করছি তো'। আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনা।

তবে আমাদের হস্টেলে প্রতিবছর মে-র গোড়ার দিকে বেশ ভালরকম রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান হত। ম্যাথেম্যাটিকাল স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের এক প্রফেসরের মা বিশ্বভারতীতে রীতিমতো গানের তালিম নিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রভারতীতে গান শেখাতেন। তিনি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বৈশাখে কোনো এক সন্ধ্যায় আমাদের টেব্ল্ টেনিস হলের মেঝেতে ফরাস পেতে, ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে, নানারকম বাদ্যযন্ত্র সহকারে অনেক দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান করতেন। দু-একটা খবরের কাগজের প্রতিনিধিও থাকত। অনুষ্ঠানের দিন দুপুরে ঐ প্রফেসর আর তাঁর এক সহকর্মী এসে আমাদের দিয়ে হলঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিতেন। আমরা খুশীমনেই খাটতাম ওঁদের ফাইফরমাশ। সন্ধ্যের মুখোমুখি শুরু হত শ্রোতৃসমাগম – চেনাঅচেনা কত মুখ। আমাদের দু-একজন গম্ভীরমুখো প্রোফেসরকে এই মঞ্চে দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেখে তাঁদের সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু এক আধ্যাপিকা ছিলেন যাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে কারুর কোনো সংশয় না থাকলেও গলাটা – সত্যি বলতে কি – ঠিক রাবীন্দ্রিক ছিলনা। অনার্স ক্লাসে গুরুগম্ভীর লেক্চারের উপযোগী রাশভারী গলা। তবু ভদ্রমহিলা বেশ কয়েকবার গেয়েছিলেন ঐ অনুষ্ঠানে। একবার 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'র মতো নরম গলার গানও বেছেছিলেন সাহস করে। সেই সন্ধ্যায় অন্য কাগজের সঙ্গে আনন্দবাজারের প্রতিনিধিও উপস্থিত। পরে দেখলাম 'দেশ' পত্রিকার পিছনের দিকের পাতায় রিভিউ বেরিয়েছে, ''সঞ্চারীতে এসে 'তুমি যদি না দেখা দাও' বলে উনি এমন হুংকার ছাড়লেন, যেন দেখা না দিলে পুলিশ-কেস করবেন'' !

এমনি করেই টুকরোটাকরা মণিমাণিক্য কুড়োতে কুড়োতে কেটে গেল পাঁচটা বছর । বিদায়ের দিন এসে গেল আমাদের । জুনিয়র ব্যাচেরা সবাই মিলে ফেয়ারওয়েল দিল হস্টেলে । তাতে কেউ কেউ 'ভরা থাক ভরা থাক স্মৃতিসুধায়', 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা', 'পুরানো সেই দিনের কথা' এইসব বিদায়-অনুষ্ঠানের চিরাচরিত গানগুলো গেয়েছিল । কিন্তু সবচেয়ে বেশী মনে আছে যেটা, সেটা ওদের বানানো মান্না দে-র বিখ্যাত গান 'কফিহাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'-এর এক মজার প্যারোডি - 'ক্যালকুলাসের সেই গাড্ডাটা আজ আর নেই' । মূল গানের 'নিখিলেশ', 'মইদুল', 'অমল', 'সুজাতা' এইসব চরিত্রগুলোর জায়গায় পছন্দের-অপছন্দের প্রোফেসরদের নাম বসিয়ে প্যারোডিটা তৈরী । আমাদের ব্যাচের অনেকেই ইউরোপ-অমেরিকার নানা ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়ে বাইরে চলে গেল । আমি এলাম কানেক্টিকাটে । আজও মনে পড়ে চলে আসার আগের দিন-পনেরোর কথা । বাড়ীতে কত তোড়জোড়, কত উদ্বেগ-আশঙ্কা, কত শুভেচ্ছা-উপদেশ । ছোটখাটো উপহার পেলাম অনেকের কাছ থেকে । তার মধ্যে অন্যতম আমার যে দিদি-জামাইবাবুর কথা আগে লিখেছি, তাদের দেওয়া একটা অখন্ড গীতবিতান । তার প্রথম পাতায় সুন্দর করে লেখা, 'বঙ্গসংস্কৃতির, ভারতীয় কৃষ্টির প্রতীক এই মহাগ্রন্থ বাহ্যিক সম্পদের দেশে তোমায় অন্তরের সম্পদে সমৃদ্ধ করে রাখুক' ।

মার্কিন মুলুকে এসে প্রথমেই পড়লাম বাঘের খপ্পরে । অর্থাৎ কিনা 'বি এ জি এইচ' – বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ গ্রেটার হার্টফোর্ড । পুজো, বিজয়া সম্মিলনী ছাড়াও ওরা ছোট করে বাংলা নববর্ষ আর রবীন্দ্রজয়ন্তীর একটা অনুষ্ঠানও করত । একবার 'শ্যামা'ও করেছিল । নাচ-গান-ভাষ্যপাঠ মিলিয়ে সে এক বিরাট দল । এর বাড়ী তার বাড়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকগুলো রিহার্সাল । জীবনে প্রথমবার আমিও পুরুষকণ্ঠে কোরাসের দলে ভীড়ে গিয়েছিলাম – ওদের পুরুষকণ্ঠ কম পড়ছিল বলে । প্রতিটা রিহার্সালেই খাওয়াদাওয়া হইহুল্লোড় মিলিয়ে কেমন একটা পিকনিক-পিকনিক আবহাওয়া । নতুন অভিজ্ঞতা, তাই খুব উপভোগ করেছিলাম । কিন্তু হায়, আসল অনুষ্ঠানের দিন মাইকের এমন গন্ডগোল যে ভিডিও রেকর্ডিং-এ ছেলেদের গলাটাই ভাল করে উঠল না । বেশ হতাশ লেগেছিল । অবাকও হয়েছিলাম, কারণ মাইকের গন্ডগোল ব্যাপারটা তো আমাদের মাণিকতলা মিলন সমিতি বা ফুলবাগান শক্তিসংঘের সারারাতব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠানে হয়ে থাকে – আমেরিকায় কেন হবে ?

সেই শুরু । তারপর আরো দু-দশক কেটে গেছে এ-দেশে । কানেক্টিকাট ছাড়ার পর কর্মসূত্রে ডেট্রয়েট, অ্যান্ আর্বর, রলে-ডার্হ্যাম, মিল্ওয়াকি, হিউস্টন, সীয়্যাট্ল্ – অনেক ঘাট ছুঁয়ে আপাততঃ ওহায়োর ক্লীভল্যান্ডে নোঙর করেছি । প্রতিটা শহরেই ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী সমাজের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, কখনো কখনো সেই আলাপ গড়িয়েছে ঘনিষ্ঠতা অবধিও । সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে নিজে সমৃদ্ধ হয়েছি, বিনিময়ে দেবারও চেষ্টা করেছি যতটুকু সাধ্য । সব দেখেশুনে একটা ব্যাপারে আমি আজ নিঃসংশয় । ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গত পঁচাত্তর বছরে গঙ্গা আর মেঘনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে । বাংলার সাহিত্যগগনে বহু নক্ষত্র, আধা-নক্ষত্র ও স্বঘোষিত নক্ষত্রের উত্থানপতন ঘটেছে এই সময়ে । কিন্তু অনেক বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে, শক্তি-নীরেন্দ্র-প্রেমেন্দ্র, সুনীল-সমরেশ-শীর্ষেন্দু, বনফুল-মৌমাছি-কালো ভ্রমর আর সুবোধ-মল্লিকা-শ্রীজাত পেরিয়ে এসেও প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ভরকেন্দ্র এখনো সেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল (আর হয়তো সত্যজিৎ রায়) । এটা তাঁদের অর্থাৎ প্রবাসী বাঙালীদের প্রগতিশীলতার অভাব, পরিবর্তনবিমুখতা বা ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে আধুনিক বঙ্গমনীষার বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অনবধানতার জন্য নয় । আসলে তাঁরা অনেকেই দেশ ছেড়েছেন বেশ কয়েক দশক আগে । তাই তাঁদের চিত্তাকাশে দেদীপ্যমান রবির কিরণপ্রভা নবযুগের নক্ষত্রদের চুঁইয়ে-আসা সম্মিলিত আলোয় ম্লান হয়ে যেতে পারেনি । জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ির টান আরো তীব্রভাবে অনুভব করাতে পারে, জন্মভূমির স্মৃতিকাতরতা আরো নিবিড়ভাবে উস্কে দিতে পারে – এরকম কোনো বিকল্প মাধ্যম তাঁরা আজও পাননি ।

সুতরাং মনে হয় 'আজি হতে শতবর্ষ পরেও' এই মহাপুরুষের 'ভূবনজোড়া আসনখানি হৃদয়মাঝে বিছানো' রয়েই যাবে আমাদের । বসন্তে বসন্তে আমরা আমাদের কবিকে ডাক দেব বারংবার, বলব, 'শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও'।

সুজয় দত্ত ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যার তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

400 Years of William Shakespeare

Jill Charles

What makes William Shakespeare the most widely read, translated and published English writer for 400 years? His 37 plays and poems have been translated into 80 languages and remain in print centuries after his death. Why is Shakespeare's writing so well loved, far beyond the time and place he lived in?

William Shakespeare was born on April 23, 1564 in Stratford-upon-Avon, England. His birthdate is estimated from a church record of his baptism on April 26; sixteenth century infants were traditionally baptized three days after birth. Shakespeare's father was a glovemaker and he attended the King Edward VI grammar school, learning Latin and Greek as well as basic writing, reading and arithmetic.

At age 18, William married Anne Hathaway, a woman eight years his senior. They would have three children, a daughter named Susanna in 1583 and twins Judith and Hamnet in 1585. Shakespeare left Stratford for London in 1585, motivated to start a theater company in the capital city. Shakespeare would spend much of his adult life away from his family.

In London in 1594, Shakespeare founded the Lord Chamberlain's Men acting company and began to produce his plays such as "Romeo and Juliet" and "A Midsummer Night's Dream." His plays offered dramatic swordfights, tender love scenes, witty wordplay and social commentary to appeal to men and women of all classes, from groundlings who paid a few coins to stand in front of the stage to nobility in box seats, to Queen Elizabeth I who attended a performance of "Twelfth Night" in 1601.

Shakespeare's appeal to a diverse audience, from his time to ours, comes from his empathetic, insightful depiction of every kind of character from from young lovers to kings to killers. In "Twelfth Night," a young woman named Viola escapes a shipwreck and disguises herself as a man for safety in a strange land. Viola finds herself in a love triangle between Duke Orsino (a man she favors) and Lady Olivia (who mistakes Viola for a young man and falls in love with her.) In many other Shakespeare plays, women dress as men for protection when running away from home (Rosalind in "As You Like It") or for freedoms only men had (Portia in "Merchant of Venice" disguises herself as a male lawyer to defend her beloved Antonio.)

Why did Shakespeare depict women in male disguises? Was this just a convenience for his actors? In Shakespeare's time acting was considered immodest for women and all the female roles in the theater were played by young, beardless teenage boys. Having a character like Viola or Portia wear men's clothes simplified the actors' costumes, but Shakespeare's dialogue shows deeper reasons for the gender mystery in his plays. In a time when daughters were owned by their fathers and wives were their husbands' property, Shakespeare boldly raised questions about what would women could do, and be, if allowed to act freely and speak for themselves. In her male guise, Viola argues with Duke Orsino that although "We men may say more, swear more...Too well what love women to men may owe. In faith, they are as true of heart as we." No wonder Queen Elizabeth I, risking her throne and sometimes her life as a female monarch, enjoyed watching "Twelfth Night."

At a time when England struggled with religious conflicts between the new Anglican church of England and the Catholic church of Rome and began exploring new lands in the Caribbean, Africa and the Americas, Shakespeare raised new questions about race, culture and identity. In "Othello" African Othello and Italian Desdemona marry and live happily despite their different origins, until a false rumor attacks their love. Many critics have tried to ban Shakespeare's play "The Merchant of Venice" for anti-Semitism in its depiction of the Jewish villain Shylock, who demands a literal pound of flesh from his creditor Antonio. When reading the play it becomes clear that Shylock's longing

for revenge came from years of being spat on and cursed daily in the marketplace by Antonio and other Christians. Shylock also loses his daughter Jessica who steals his life savings, abandons her family and faith to marry a Christian man. Shylock does not choose evil because of greed or ambition like Macbeth or Brutus in "Julius Caesar", he becomes cruel because he has never been treated justly. "The Merchant of Venice" deserves to be read if only for one of the strongest condemnations of prejudice in literature when Shylock asks the audience "Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge?" At a time when anti-Semitic violence was the norm and slavery and colonialism were spreading in the Caribbean and the Americas, Shakespeare demanded that his audience see the humanity of every person, no matter what their religion, race or country of origin. In our own time with wars still raging over religion and racism and sexism still producing crimes from job discrimination to murder, we must all ask ourselves the questions Shakespeare asked about what humanity means and what rights belong to all people.

Starting in the 1800s some critics began to question whether William Shakespeare of Stratford, a commoner with a grammar school education, could have written plays with the lyricism of "Hamlet" and the political insight of "Julius Caesar." They pointed to different spellings of Shakespeare's signatures on his plays but especially to an intellectual sophistication that they believed belonged only to the upper classes, to possible playwrights such as Christopher Marlowe, William Stanley the Earl of Derby, Edward de Vere the Earl of Oxford or even Sir Francis Bacon or Queen Elizabeth I. Not surprisingly these "anti-Stratfordians" who doubt Shakespeare's authorship have been mainly upper class themselves.

I question this low estimation of the minds of working class actors and theater workers. William Shakespeare was common by birth but exceptional in talent, insight and life experience. The saddest, starkest lines in "Hamlet" when the Danish prince contemplates death "to die, to sleep, perchance to dreams, but in that sleep of death what dreams may come?" were written in 1596 the year Shakespeare's own son Hamnet died, far away from his father in London. No one in Shakespeare's lifetime questioned his authorship of his plays.

Shakespeare eventually returned to Stratford, not rich or powerful, making a living by farming, not the theater, in his old age. He died in 1616 leaving simple items like his home's "second-best bed" to his wife Anne Hathaway and surviving daughters Susannah and Judith and putting a curse on anyone who might have dared to move his bones from under his tombstone in the Stratford churchyard. Had he lived safely in a castle surrounded by wealth in a fortunate family, William Shakespeare could never have written about struggling characters like Hamlet, Viola, Othello and even Shylock so empathetically.

It is not only Shakespeare's clever invention of phrases like "All's well that ends well" and "break the ice" that keeps his memory alive. It is his care about the human condition, his critical examination of gender, race, class and human rights that makes his plays meaningful from the 1500s to today, in countries far beyond the England he knew. Shakespeare speaks to the human condition, not only in his day, but in any time and place where people struggle to be free, to provide for their families, to live free of persecution or to simply marry those they love. The best lesson I learned from Shakespeare was to see beyond my own point of view, to empathize and seek insight and listen to others, long after the curtains closed and the plays ended.

নাইদার নাইট নর ডে

ইন্দ্রানী দত্ত

১

লীভস্

একশ তিরিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরের দুই ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ যখন মহাশূণ্যে তরঙ্গ তৈরি করছিল, সেই সকালে, রাজীব আর মায়ার বাড়ির পিছনের সুইমিং পুলের ওপর একটি ফড়িং উড়ছিল। সকালগুলো এরকমই সচরাচর - জলের ওপর ফড়িং, পাখি, প্রজাপতি, রাজীব ব্যস্ত, কফি, ল্যাপটপ আর অফিস বেরোনোর প্রস্তুতিতে, মায়া কখনও বাগানে জল দিচ্ছে, পুলের পাম্প অন করছে, জলে পড়ে থাকা ঝরা পাতা, ছোট ডাল পরিষ্কার করছে। বস্তুতঃ এই বাড়ি, এই বাগান, এই পুল মায়ার জীবনে অনেকখানি। আর ফেসবুক। এই জগতের বাইরে অন্য কোনো কিছু - সে মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গই হোক কি সিয়াচেনের তুষারধস - এমন কিছু যাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেলফি তুলে সে ফেসবুকে শেয়ার করতে পারবে না - মায়াকে সম্ভবতঃ স্পর্শ করত না।

মায়ার জলপ্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত, অথচ সে সাঁতার জানত না। সেই নিয়ে, মায়ার বিয়ের আগে আত্মীয় বন্ধুমহলে হাসিঠাট্টা লেগে থাকত। রাজীব তাতে যোগ দেয় বিয়ের পরেই যখন হনিমুনে গিয়ে, চেক ইন করার তিনঘন্টার মধ্যে হোটেলের জলের ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যায়। সেই রাতে রাজীব নতুন বউকে নদীর ধারে বাড়ির প্রতিশ্রুতি দেয়। হনিমুনের প্রতিশ্রুতি সততঃ উদ্বায়ী কিন্তু রাজীব কথা রেখেছিল। শুধু নদীর বদলে সুইমিংপুল। এই বিচ্যুতিটুকু বিদেশবাস দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছিল রাজীব। ফলতঃ মায়ার আর কিছুই চাইবার ছিল না। বাড়ি, বাগান, সুইমিং পুল, আর ফেসবুকে সে সবের ছবিতে শতখানেক লাইকে তার জীবন ও সুখ সংজ্ঞায়িত হচ্ছিল।

আজ সোমবার। আজকের দিনটা আলাদা। কাল বিকেল থেকে পুলের পাশে ছড়িয়ে আছে পুল কাভার, পুলি, দড়ি, কাঁচি, রাজীবের চপ্পল। পুলের জল ঢেকে দেবে রাজীব তারপর পুল বুজিয়ে ফেলবে - ঘোঁত ঘোঁত করে এই কথা বলে বেরিয়ে গেছে রাতে। ভোর অবধি ফেরে নি। সূর্য উঠে গিয়েছিল। সকালের কমলা আলোয় ভরে ছিল পুল, পুলের পাশে গাছ, ফড়িং এর ডানা আর মায়ার মুখ। পুলের জল পরিষ্কার, একটা পাতাও পড়ে নেই, ঝকঝকে আকাশের প্রতিফলনে আরো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে জল, পুলের তলদেশ দৃশ্যমান। ফড়িং এর ছোটো, কালো ছায়া যখন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর জলে পড়ছিল, ঝরা পাতার ভগ্নাংশ হিসেবে ভ্রম হচ্ছিল মায়ার। ফড়িং, জলের খুব কাছ দিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উড়ছিল। পুলের এক দিক থেকে অন্য দিকে উড়ে যাচ্ছিল আবার ফিরে আসছিল, যেন জলের সমান্তরাল কোনো বাতাসের তরঙ্গে সাঁতার দিচ্ছিল। ফড়িং এর ডানা জলের উপরিভাগ স্পর্শ করছিল না, অথচ সঞ্চারমান কালো ছায়াটি সর্বক্ষণ জলের ওপর ছিল, এমন কিছুই ঘটছিল না যাতে ছায়াটি অন্তর্হিত হয়। মনে হচ্ছিল, জল যেন ছায়াটিকে সর্বক্ষণ এক অদৃশ্য ট্র্যান্সমিটার রিসিভারের কৌশলী যোগাযোগে গোচরে রাখছে। যেন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ফড়িং এর যাত্রাপথ, ডানার গতি, উচ্চতা। আজ মায়া চাইছিল ট্র্যান্সমিটার রিসিভারের এই অখন্ড যোগাসাজস বিঘ্নিত হোক, ফড়িং, তার ছায়া সমেত ট্র্যান্সমিটারের পাল্লার বাইরে কোথাও চলে যাক, একদম হারিয়ে যাক। বাগানের পশ্চিমদিক থেকে একটা হাল্কা গুঞ্জন আসছিল। নাসরীন এতদিন যে দুঃখবাজারের কথা ওকে বলে এসেছে, সেই বাজার এখন যেন ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে - এরকম অনুভূতি হচ্ছিল মায়ার। মনে হচ্ছিল, অনেক লোকের ভীড় অপেক্ষা করে আছে খুব কাছেই কোথাও, রাতের দিকে দেখা হয়ে যাবে। ছোটোবেলা থেকে শুনে আসা মাসি, পিসি, মা, দিদার সবার প্রথম পুরীর সমুদ্র দর্শনের গল্প, মায়ার প্রথম দেখার সঙ্গে যেমন হুবহু মিলে গিয়েছিল - সেরকমই কিছু ঘটবে এক্ষেত্রে - এরকম মনে হচ্ছিল মায়ার। সকালের চা

খায় নি মায়া, রাতের জামা বদলায় নি, মায়ার উস্কোখুস্ক চুল, মায়ার চোখের তলায় কালি । মোবাইলে অজস্র মেসেজের নোটিফিকেশন দপদপে লাল আলো জ্বালিয়ে জানান দিচ্ছিল রাত থেকে; সকালে চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় আপাততঃ মৃত । সকালের যাবতীয় কাজকর্ম পড়ে আছে । নাসরীন বর্ণিত দুঃখবাজার এবার সেও দেখতে পাবে - এহেন প্রত্যাশায়, নিতান্ত দীনহীনের মত, জলের ধারে রাত নামার অপেক্ষায় বসেই রইল মায়া ।

২

ফাইভ কুইনস স্ট্রীট

বছর দুয়েক আগে, এপ্রিলের মাঝামাঝি রাজীব মায়াকে এ বাড়ি দেখাতে নিয়ে আসে । পুরোনো বাড়ি, বাগান আলো করে ম্যাগনোলিয়া ফুটেছিল, সবুজ ঘাসে লন ভরে ছিল, গাছের ডালে লাল নীল পাখি, বাথরুমে বাথটব, বাড়ির পিছনে সুইমিং পুল । মায়ার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল - ছবি তুলে পাঠাতে লাইকে লাইকে ভরিয়ে দিয়েছিল ওর ফেসবুকের বন্ধুরা । এজেন্টের কাছে অফার করেছিল রাজীব পরদিনই, বাড়ির তৎকালীন মালিক প্যাট্রিক ব্যক্তিগত কারণে কিছু সময় চেয়েছিল; অতঃপর, সমস্ত ফরমালিটিজ মিটিয়ে, সে বছর জুলাইতে এবাড়িতে চলে এসেছিল রাজীব আর মায়া ।

এবাড়িতে প্রাক্তন বাসিন্দাদের গল্প মায়া প্রথম শোনে নাসরীনের কাছে অক্টোবরের সকালে । আগের রাতে মায়ার নতুন বাড়ির বাথরুমে সাপ ঢুকেছিল । মাঝরাত নাগাদ বাথরুমে ঢুকে আলো জ্বালতেই, কমোডের সিস্টার্নের ওপর অসম্ভব সুদর্শন, শান্ত পাইথনটিকে দেখতে পায় মায়া । মোবাইলে ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করে সঙ্গে সঙ্গে । তারপর রাজীবকে ডাকে । রাজীব সাপের গায়ে জল ছুঁড়ে দিলে সে নেমে আসে মেঝেয়, রাজীব বড় বালতি উপুড় করে দেয় সাপের ওপর, বাগান থেকে ইঁট এনে বালতির মাথায় রাখে, এমার্জেন্সিতে ফোন করে । রাতেই কাউন্সিলের লোক এসে কফি খেয়ে সাপ নিয়ে যায়, ওদের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে বার বার । মাঝরাতের পরে আলো জ্বলা, এমার্জেন্সি ভেহিকেলের হুটারের আওয়াজে সে রাতেই প্রতিবেশীরা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ওদের বাগানে জড়ো হয় । বস্তুতঃ সে রাতেই, ওদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের আলাপ হয় ভালো করে । নাসরীনের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা । ম্যাগনোলিয়ার তলায় বেগুণী ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নাসরীন দাঁড়িয়েছিল । মায়ার দুহাত ধরে বলেছিল, ভয় নেই । প্যাট্রিকের পোষা সাপ, কাউকে কিছু বলে না । আমি নাসরীন । তোমার পুলের দিকের ফেন্স টপকালেই আমার বাড়ি । সেন্ট এডোয়ার্ড হসপিটালের নার্স । কাল আমার নাইট শিফট । সকালের দিকে আসব আবার ।'' বাচ্চাদের স্কুল বাসে তুলে দিয়ে নাসরীন এসেছিল মায়ার কাছে । নিজের কথা বলেছিল অল্প করে । ও নাসরীন, নাসরীন জলিল, পাকিস্তানের মেয়ে । মায়ারই বয়সী । ষোল বছর বয়স থেকেই এ দেশে । স্বামী পারভেজ, দুই ছেলে বকর আর ফিরোজ কে নিয়ে এ'পাড়ার বাসিন্দা বছর দশেক । এসব কথাই কফি খেতে খেতে বলছিল নাসরীন । মায়ার বানানো কফির তারিফ করছিল । নাসরীন বলেছিল, 'তুমি জানতে না - প্যাট্রিক সাপ পুষত ? ওর বৌ কায়লির সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যায় ঐ সাপের জন্যেই । বাড়ির সামনের ল্যান্ডস্কেপিং, সুইমিং পুল অনেক শখ করে বানিয়েছিল, সইল না । সাপ পোষা নিয়ে কী অশান্তি । শেষে ডিভোর্স । বাড়ি বিক্রির টাকাটা কায়লিকে খোরপোষ দিয়ে থাইল্যান্ড চলে গেছে প্যাট্রিক ।'

- ''এই সাপটা প্যাট্রিকের পোষা ছিল, তুমি জানলে কি করে ?''

- ''আর কোত্থেকে পাইথন আসবে ? প্যাট্রিকেরই, কাচের বাক্সে থাকত বেশ কয়েকটা । একটা পালিয়েছিল, জানতাম । প্যাট্রিক তোমাদের বলে নি ।''

সেই সকালে, মায়ার সুখভরা মনে পোষা সাপ, ডিভোর্স আর অ্যালিমনি শব্দগুলো খচ খচ করে ঢুকেছিল । এবাড়িতে সাপ ছিল একদা, এ বাড়িতেই বিচ্ছেদ হয়েছিল নবীন দম্পতির - এই সব মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল মায়ার ।

নাসরীন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল । কফির কাপ নামিয়ে রেখে বলেছিল; এদেশে এসব জলভাত, এনিয়ে মনখারাপ কোরো না । আবার দ্যাখো, তোমার পিছনের

বাড়ির ডাফনিকে । গত বছর বিয়ের গোল্ডেন জুবিলি হল, সবাইকে খুব খাওয়ালো । অথচ, ডাফনির বর ফিল চিরকাল ঘোড়দৌড়, বক্সিং এর পিছনে টাকা ঢেলেছে, বাইরে বাইরেই থাকত, ডাফনি একলা বাচ্চাদের বড় করেছে । ডিভোর্স হয় নি কিন্তু ।

সকালবেলায় সাপের কথা, বিচ্ছেদের কথা ভালো লাগছিল না মায়ার । ও কথা ঘোরাতে চাইছিল । টিভি অন করে বলেছিল, 'ক্রিকেট দেখ ? ওয়াল্ড কাপের খুব বেশি দেরি নেই ।'

নাসরীন বলেছিল, 'পারভেজ আর বাচ্চারা বিশেষ করে বকর ক্রিকেট পাগল । আমার সময় হয় না'।

- ''চাকরি করে, দুই ছেলে সামলে সময় পাবেই বা কি করে ?''

- ''একদম সময় পাই না, তা নয় । যে টুকু সময় পাই, লিখি'' ।

- আরিব্বাস, তুমি লেখক ?''

- ''লিখে রাখি এই অবধিই''

- ''কোথায় পাবলিশড হয়েছে ? আমাকে পড়াবে ? তোমাদের আইস ক্যান্ডি ম্যান পড়েছি । দীপা মেহতার সিনেমা দেখার পরে । পাকিস্তানি লিটেরেচার আর কিছু পড়িনি তেমন ।''

- ''আরে আমি কি বাপসি সিদ্ধার মত নামকরা কেউ ? আর আমাদের লিটারেচর তোমাদের লিটারেচর বলে আলাদা করে কিছু হয় নাকি !''

- ''এই রে ! রাগ করলে ! পড়াবে তো তোমার লেখা !''

- ''আমার লেখায় নতুন কিছু নেই । সাধারণ লেখা, যেমন হয় । কাল একটা বই দিয়ে যাব, আন্দাজ পাবে । বিকেলে থাকবে তো বাড়িতে''?

রাতে বাড়ি ফিরে রাজীব বলেছিল, ''একটু সাবধানে মিশো । বাচ্চাগুলো-ও খতরনাক । একটা টিনএজার গত সপ্তায় আইসিস জয়েন করতে যাচ্ছিল, এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে । টিভিতে দেখনি ? দিনকাল ভালো নয়, বুঝলে ?''

- ''সেই জন্যেই তো ছেলেপুলের ঝামেলায় যাই নি'' হেসে গড়িয়ে রাজীবের গলা জড়িয়ে ধরেছিল মায়া । গলা জড়ানোর সেলফিটা সকালে ফেসবুকে পোস্ট করে দিয়েছিল ।

৩

শী হু ওয়েন্ট লুকিং ফর বাটারফ্লাইজ

পরদিনই নাসরীন তেরোখানি ছোট গল্পের কালেকশান - 'নাইদার ডে, নর নাইট - থার্টিন স্টোরিজ বাই উইমেন ফ্রম পাকিস্তান' দিয়ে যায় । মায়া সূচিপত্রে যায় প্রথমেই ।

- ''কিরণ বশীর আহমেদ, নিক্কত হাসান, জাহিদা হিনা, খালেদা হুসেইন, সাবিন জাভেরি জিলানি, সোনিয়া কামাল, সুরাইয়া খান, মনিজা নকভী . . . ওমা, কোথায় তোমার নাম ? নায়রা রহমান, শেভা সরওয়ার, বীণা শাহ, কইসিরা শেহরাজ, মুনিজা শামসী' - আর তো নেই . . . তোমার গল্প কোথায় ? ছদ্মনামে লিখেছ'' ?

নাসরীন হাসে - '' হয় একটাও নয়, আবার হয় তো সব কটাই আমার''।

ফেসবুক হ'লে এই হেঁয়ালিতে চোখ বুজে লাইক দিত মায়া । ওর ভ্যাবলা দৃষ্টি নাসরীনের চোখ এড়ায় না । হেসে বলে যায়, ''সময় পেলে পড়ে রেখো''।

বই এর মলাটে একটি মেয়ের চোখ, ভ্রু, নাক আর কপাল এর সমান্য অংশ । বাকিটা আড়ালে । বইটার একটা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে মায়া - তলায় ক্যাপশন দেয় - 'অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে' । তারপর বই এর পাতা উল্টায় । পাঠশেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে কপাল ঢাকে, অন্য হাতে নাক থেকে চিবুক । নিজের মলাটের ছবির মত লাগে অনেকটা ।

বইটা ফেরত দিতে মায়া নাসরীনের বাড়ি যায় । নাসরীনের নাইটশিফট, বিকেলে বেরোবে, ছেলেরা স্কুলে, শান্ত ঘরদুয়ার; ওদের ল্যাব্রাডর ভারি শরীর নিয়ে ল্যাজ নাড়ল তারপর আবার ধপ করে শুয়ে পড়ে মায়ার পায়ের কাছে । মেজেনাইনে নাসরীনের পড়ার ঘর । দেওয়ালের তাকে বই, টেবিল, ল্যাপটপ, টবে একটা বনসাই । সেখানে চা নিয়ে আসে নাসরিন ।

- 'খাও তো চা ? না কি কফি'

- 'না না চা । কলকাতা না ? তুমি কি লাহোরের মেয়ে ?'

- করাচীর, তবে আমার ঠাকুর্দা, ঠাকুমা পাঞ্জাবের ।

- করাচীর ? তাহলে, এরপর থেকে বাড়ি গেলে করাচী হালুয়া আনতে হবে আমার জন্য ।'

- 'সেই যে ক্লাস টেন পাশ করে এদেশে চলে এসেছি, আর যাই নি ওখানে, যাই না ।'

- 'সে কি ? একবারও যাও নি ?'

- 'সে অনেক কথা । পরে কোনদিন বলব । তুমি বলো, কোন গল্পটা সব থেকে ভালো লাগলো ?'

- নাইদার নাইট নর ডে । মেয়েটা আম কিনে এনে খাচ্ছে, মুখে হাতে রস লেগে যাচ্ছে, টপ টপ করে রস পড়ছে দামী কার্পেটে । মেয়েটা তারপর ভ্যাকুয়াম চালিয়ে সেই সব দাগ মুছছে । ধুপ জ্বালিয়ে আমের গন্ধ তাড়াচ্ছে । মেয়েটার বর বিদেশী, একদিকে সাউথ এশিয়ান কালচারের চর্চা করে, রাশদি পড়ে, ইয়োগা করে, অন্যদিকে বৌ মাছের ঝোল রাঁধলে, নিজের জামা কাপড় প্লাস্টিকের মোড়কে সিল করে রাখে ।

- 'ধুপ আর মাছের ঝোল ছিল না গল্পে, ছিল আর রুম ফ্রেশনার ।।। এইরকম কিছু ।।।

- ''আই নো । মাছের ঝোলটা তো আমি বললাম । এই ক্যান আইডেন্টিফাই ।''

'উই অল ক্যান' ।

- 'আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে, নাসরীন ? আমার অনেক দিনের শখ, কেউ গল্প লিখুক আমাকে নিয়ে' ।

নাসরীন হাসল,

- ''বেশ তো । লিখব । তোমাকে নিয়ে লিখলে, কি নাম দেব গল্পের ? এনি সাজেশন্স ?''

- ''গল্প নয় গল্প নয়, উপন্যাস লিখো । নাম এই বইটার নামেই দিও - নাইদার নাইট নর ডে । এক একটা চ্যাপ্টার এক একটা গল্পের নামে দিও - লীভস, ফাইভ কুঈনস স্ট্রীট, নাইদার ডে নর নাইট, আ স্যান্ডস্টোন পাস্ট এই রকম ।''

- 'হয়তো তুমিই লিখবে একদিন'

- 'দূর আমি কি লিখব ? আমার দৌড়, ফেসবুকে দু লাইন' ।

- 'তা নয় মায়া । তুমিও হয়ত লিখবে একদিন । আসলে, একটা নদী আছে কোথাও, দেখা যায় না, তবে আছে । সেই নদীর ধারে, সন্ধ্যার পরে অদ্ভুত এক হাট বসে । সেখানে দুঃখের বেচাকেনা হয় । ঐ নদী যেদিন দেখতে পাবে, লেখা ছাড়া হয়তো আর গতি থাকবে না ।'

৪

আ ব্রিফ অ্যাকোয়েন্টেনস

নাসরীন পেয়ারা দিয়ে গিয়েছিল, ওদের গাছের পেয়ারা । মায়া লেবু পাঠায় । নাসরীন কারিপাতা দিলে, মায়া বাগান থেকে তুলে এক ঝুড়ি লঙ্কা পাঠায় । হ্যালোইনের আলো বানাবার জন্য ফিরোজ আর বকরকে বাগানের কুমড়ো পাঠায় । তারপর বিরিয়ানি পর্ব শুরু হয় । নাসরীন বিরিয়ানি রেঁধে পাঠালে, মায়া স্যামনের পাতুড়ি পাঠিয়েছিল । কোনদিন গুলাবজামুন । রাজীব আঙুল চেটে বলে, 'এতদিনে একজন ভালো বন্ধু পেয়েছে তুমি । ওয়াও কী রান্না !'

মায়া চাইছিল, নাসরীন ওদের বাড়িতে আরো আসুক, পরভেজকে নিয়ে, দুই ছেলে, ল্যাব্রাডর নিয়ে । সেই সঙ্গে রাজীবকে নাসরীনের পড়ার ঘর, ঠান্ডা মেঝে, বনসাই দেখাতেও ইচ্ছে হচ্ছিল ওর । বকর আর ফিরোজকে রোববার রোববার ওদের পুলে সাঁতার কাটতে আসতে বলে দিল মায়া ।

- 'ওরা ভীষণ জল ভালোবাসে, কিন্তু তোমাদের অসুবিধে হবে না ? ছুটির দিনে হৈ চৈ, ভালো লাগবে তোমার মিস্টারের ?

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খুশি হবে, বাচ্চা টাচ্চা এলে তো ভালো লাগেই ।'

হই হই করে শুরু হয়ে গিয়েছিল সাঁতার, কোনোদিন

পারভেজ আসত ছেলেদের সঙ্গে, কোনো কোনোদিন নাসরীন, মায়া, রাজীবের দু-একজন বন্ধু ও আসত তাদের বাচ্চাদের নিয়ে রোববার রোববার বার বি কিউ, সাঁতার, বীয়ার । ক্রিকেটের গল্প, বলিউড । সলমনের আর হৃতিকের ফিল্ম রিলীজ করলে অন লাইনে ৬ টা টিকিট কাটত মায়া অথবা নাসরীন । ক্রিকেট ম্যাচেরও । কোন দিন ভারত পাকিস্তান খেলা হলে কে কাকে সাপোর্ট করবে এই নিয়ে মৃদু রসিকতাও হত । রাজীব বলত - 'আমি বিরিয়ানির সাপোর্টার' । পারভেজ বলত 'আমি গুলাবজামুনের' । দুই সখি কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে হাসত, বাচ্চারা জলে ঝাঁপাতো, বৃদ্ধ ল্যাব্রাডর থাবায় মুখ গুঁজে চোখ মিটমিট করত ।

আই সি সি ওয়াল্ড কাপের পুল বির খেলা পড়ল ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান । ঠিক হ'ল, শহরের একটা পাবে জায়ান্ট স্ক্রীনে খেলা দেখতে যাবে রাজীব, ওর বন্ধু সন্তোষ আর পারভেজ । ডে নাইট ম্যাচ, ওদের ফিরতে দেরিই হবে ।

দুপুর হতেই দুই সখী ফিরোজ আর বকর কে নিয়ে নাসরীনের বাড়িতে টিভির সামনে বসেছে । ভারত ব্যাট করছিল প্রথমে । দুরন্ত খেলছিল ধবন, বিরাট আর রায়না । বল উড়ে পড়ছিল বাউন্ডারির বাইরে । বাচ্চারা হাত তালি দিচ্ছিল - ওরা কোহলির ফ্যান । নাসরীন চুপচাপ - শান্ত স্থিত উচ্ছাসহীন । মায়া অস্বস্তিতে ভুগছিল ভাবছিল, ইন্ডিয়া এত ভালো না খেললেই পারত আজ । ভাবছিল, বিরাট আউট হয়ে যাক, ইন্ডিয়া হারুক ।

বস্তুতঃ উল্টোটাই ঘটছিল । পাকিস্তান ৩০০ রান চেজ করছিল । শুরুটা ভালই ছিল । কিন্তু ১০২ থেকে ১০৩ রানের মধ্যে তিনটে উইকেট পড়ে আর তারপর শহীদ আফ্রিদির ক্যাচ বিরাট ধরে নিতেই মায়ার মুখ শুকিয়ে আসে । গলা খাঁকরে বলে, এবারে খেয়ে নিলে হত না ?

নাসরীন বলল, 'দোন্ট ওয়ারি, দে আর এনজয়িং দ্য গেম ।'

বস্তুতঃ বকর আর ফিরোজের মধ্যে কোন হেলদোল দেখছিল না মায়া । চার, ছয় বা কেউ আউট হলেই ওরা সোফায় উঠে নাচছিল ।

খেলা শেষ হতে মায়া বাড়ি ফিরে এলো । ইন্ডিয়ার জয়ে ও কষ্ট পাচ্ছিল আর এই অনুভূতিটা আরও বড় কষ্টের জন্ম দিচ্ছিল ওর মনে । নাসরীনকে বলেছিল - 'মাথা ধরে গেছে, আজ আর খাবো না' ।

রাত বাড়ছিল; এতক্ষণে রাজীব, পরভেজদের ফিরে আসার কথা । মায়া ফোন করছিল বারবার । ফোন বেজে যাচ্ছিল রাজীবের, পারভেজের, সন্তোষের । নাসরীনকে বলতে, সে ওকে আশ্বস্ত করেছিল, হেসে বলেছিল - 'আরে বিলকুল বে ফিকর রহ । পিকে আয়েঙ্গে না'

ভোর রাতে পুলিশের গাড়ি এসে নামিয়ে দিয়েছিল পারভেজ আর রাজীবকে । দুজনেই রক্তাক্ত। পাবে মারামারি হয় ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের সাপোর্টারে । সন্তোষ গ্রেফতার হয়েছিল, রাজীব আর পারভজকে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ ।

ঘর্মাক্ত রক্তাক্ত রাজীব ঘরে ঢুকেই প্রথম কথা বলে - 'রোববারের পার্টি খতম । ও বাড়িতে আর যাবে না তুমি । ও বাড়ির কোনো শালা যেন এ বাড়িতে না ঢোকে' ।

এরপরে, যেমন হয়, এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল এবাড়ি, পাশের বাড়ি । ট্র্যাশ ফেলতে, বাগানে জল দিতে গিয়ে মুখোমুখি হলে মায়া হেসেছে, হাই বলেছে । রাজীব বাড়িতে না থাকলে ফোন করেছে নাসরীনকে । সেদিনের রক্তারক্তির কথা কেউই তোলেনি আর । দুজনেই বুঝেছিল, আগের মত আর হবে না কোনদিন । যা ঘটেছে, ভবিতব্যই ছিল ।

সেদিন রোববার, দুপুরনাগাদ, রাজীব ভাতঘুমে । মায়া পুলের পাশের চেয়ারে বই নিয়ে বসে । ফেন্সের ওদিকে ফিরোজ আর বকরের হুটোপাটির আওয়াজ পাচ্ছিল মায়া । ক্রিকেট খেলছে ব্যাকইয়ার্ডে । হঠাৎ ওদিক থেকে একটা বল উড়ে এসে ড্রপ খেয়ে পুলে পড়ল, পুলের মাঝবরাবর । আগে এমন হলে, মায়া আর রাজীব বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাতো । এবারে পরিস্থিতি ভিন্ন তার ওপর বল একদম পুলের মাঝখানে । মায়া বই মুড়ে উঠে আসে । লম্বা ডান্ডার মাথায় বাঁধা জাল দিয়ে বল তোলার চেষ্টা করতে থাকে । অধৈর্য ফিরোজ ওপর থেকে দেখতে থাকে আর চেঁচায় - 'আন্টি কুইক, কুইক' । তারপর অধৈর্য হয়ে ফেন্স টপকে জলে ঝাঁপ দেয় ।

ঝপাং শব্দটা তখনও পুরোপুরি মিলায় নি, পুলের চারদিকে জল ছিটকে পড়েছে, পুলের মধ্যে ফিরোজ আর তার হলুদ ক্যাম্বিসের বল, লম্বা জাল হাতে মায়া হতভম্ব দাঁড়িয়ে - রাজীব ঘুম ভেঙে বাইরে আসে । ফিরোজ কি বোঝে কে জানে - 'গুড আফটারনুন আঙ্কল' বলে, পুল থেকে সাঁতরে বেরিয়ে বল ছুঁড়ে দেয় ফেন্সের ওদিকে । তারপর 'বাই আন্টি' বলে ফেন্স টপকায় ।

রাজীব মায়ার হাত থেকে লম্বা ডান্ডা কেড়ে নিয়ে জলে আছাড় দেয় । ছিটকানো জলে পা ঠুকতে ঠুকতে বলে - কতবার বলেছি কতবার বলেছি আমাদের জলে ওরা নামবে না ।'' তারপর কোথা থেকে নিয়ে আসে ত্রিপল, দড়ি, কাঁচি, গ্যারাজে পড়ে থাকা পুরোনো পুলি ।

- 'খুব জলের শখ তোমার তাই না ? তোমার চোদ্দোগুষ্ঠীতে কেউ দেখেছে পুল ? কেউ এসেছে বিদেশে ? এই পুল আমার, আমার টাকা, আমার পুল । আমার পুলে তুমি টেররিস্টের বাচ্চা নামাও কোন সাহসে ? এক পয়সা রোজগার আছে তোমার ? এই পুল ঢেকে দেব আমি । কেউ নামবে না জলে, কেউ না কেউ না ।'

মায়া দৌড়ে ঘরে ঢুকতে যায়, রাজীব ওর চুল ধরে টেনে আনে, জলে ফেলে দেয় । পুলের কিনারায় জল বেশি নয় । হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মায়া কাঁদতে থাকে । ধীরে ধীরে এই বোধ তাকে গ্রাস করে, অবশ করে দেয় এই বিশাল মহাদেশে শুধু সে আর তাকে ঘিরে জল যে জলে আর দুপা গেলেই সে ডুবে যাবে ।

৫

নাইদার নাইট নর ডে

সোমবারের রাত গভীর হলে, মায়া উঠে পুলের দিকের দরজা খোলে । রাজীবের শখের নীল আলো পুলের জলে এখনও জ্বলছে । ইতস্ততঃ নীল ত্রিপল, পুলি, দড়ি, রাজীবের চপ্পল । দেখতে দেখতে মায়ার চোখের সামনে, লোনা জলের পুষ্করিণী অন্ধকার আকাশের নিচে নদী হয়ে বইতে থাকে । নদীর বুকে আলো জ্বলা নৌকাগুলি, নদী তীরে রাতের দুঃখবাজার । নাসরীন যেমন বলেছিল । নীল ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া ছোটো দোকান, কুপি জ্বলছে । তাকে ঘিরে ছায়াপিন্ডের মত ক্রেতার দল । ওপারে যাওয়ার জন্য মায়া জলে নামে । প্রথমে পায়ের পাতা । তারপর কোমর তারপর গলা জলে দাঁড়িয়ে মায়া দেখতে থাকে দুঃখশোকের বিকিকিনি । কুপির আলোয় দাঁড়িপাল্লার একদিকে জগদ্দল দুঃখর বাটখারা বসিয়ে, দোকানী কাউকে ৫০০ গ্রাম কাউকে দেড় কিলো দুঃখ বেদনা কেটে কেটে দিচ্ছে । যে যেমন চায় । ঘন নীল, সবুজ, বাদামী সেই সব দুঃখের রঙ ফোঁটায় ফোঁটায় ঘন রসের ধারা তৈরী করছে । মায়ার ঐ দুঃখের পিন্ড কেনার সাধ হয় । সে আরো এগোয় । গলা ছাপিয়ে জল কানের লতি ছোঁয়, তারপর চোখ, তারপর কপাল, সিঁথি . . .

পরদিন সকালে কমলা আলোয় ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছিল যথারীতি । আর জলতলে মায়া দুঃখপিন্ডকে মুঠোয় আঁকড়ে শুয়েছিল । তার শরীরের তলায় নিজস্ব কালো ছায়া চাপা পড়ে ছিল । আকাশে সূর্য, সুপুরি গাছ, টিভি চলছিল কোথাও । পুলের ধারে রাজীব, অ্যাম্বুলেন্স, এমার্জেন্সি সার্ভিসের লোকজন । ঘুমন্ত মায়াকে জল থেকে তোলা হচ্ছিল যখন মায়ার হাতে ধরা দুঃখপিন্ড গড়িয়ে পড়ে জলতলের আঘাতে বিচূর্ণ হয়েছিল । নীল, খুবই নীল দেখাচ্ছিল জলতল । সেই ভগ্ন দুঃখপিন্ড থেকে কোনো তরঙ্গ পুলের জল পেরিয়ে রাজীব, পুলিস, কোনো মানুষ, অথবা আরো হাজার হাজার মাইল দূরে ওয়াগা কিম্বা এল ও সি পৌঁছচ্ছিল কিনা জানা যায় না । আইনস্টাইন এইসব লিখে যান নি ।

****

ঋণস্বীকার ঃ Neither Night Nor Day : Thirteen stories by Women from Pakistan; Editor: Rakshanda Jalil

সিডনির বাসিন্দা ইন্দ্রাণী দত্ত পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্পো লেখার তীব্র আকুতি টের পান । শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয় । পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন ।

Ashray, A House Time Teller……..

Indrani Mondal

A funny thing has happened. The grandfather clock on my first floor landing doesn't chime like Big Ben anymore. It fact it doesn't chime at all. Or even tick. It is really quiet now. My doorbell doesn't ring either. The phone does ring sometimes but usually goes to voice mail. There are no footsteps on my stairs, patter of youngsters or slow, studied, mature footfalls. No laughter echoes, no voices sound, either in raised octaves or mellow, deep tones. I can't tell why. Or maybe I can?

I don't see the early bird janitor or garbage bearer with the long broom whisking dust swiftly and deftly from my front door and round my side passageways. No one sweeps or mops around my rooms. No one cleans the endless rows of lovely curios on the carved wooden corner stands or in the long etched glass showcases mounted on the walls. I have heard my lady say they were souvenirs picked up appreciatively as works of real beauty and excellent craftsmanship during her various travels with her husband, my master and landlord. Or maybe they were gifted to her by her own dad, a renowned engineer, from his extensive world tours. My lady and her husband, my lord and master, must have been people of good taste and sharp wit. I have heard them over the years talking, arguing, discussing, reminiscing, pondering, fretting but strangely, never saying goodbye to me.

They usually talked about their only child who I remember pacing up and down in her pink bedroom on my first floor before she left me for good. They said she had moved away to a faraway land not as warm and vibrant as this. I remember this little girl as a sprightly teenager, talented speaker, vibrant writer and brilliant student, as legions of her friends would meet in the hall on my third floor for rehearsals and parties. I remember peeking in on fleeting romantic moments in half curtained alcoves or my moon shadowed balcony corners. She was a strange one not conventionally pretty but with a fire of eye, charm of smile and wit of words that was hard to resist. Indeed she drew admirers to her like fireflies to the flame. As their numbers grew, my lord and lady decided it was time for their flying little birdie to build a nest and settle down. I heard them explain to her that they had arranged a Prajapatibandhan for her. Oh how the unfettered spirit fluttered and implored her parents to give her more time. I also observed the wild one's resistance wilt as her parents convinced her they had found a perfect match for her.

Soon there was a wondrous celebration all around me. Decorative colored cloth, was hoisted on tall bamboo posts to make a quaint music room for players of a fancy flute, they called sehnai. Long plaintive music echoed in the air for three long days and two nights. I heard from the teeming guests that my lord and lady had arranged their exotic only child's marriage to a rich man's son in another city. Everyone raved about the splendor of the event and the gorgeous new bride and groom. I must admit although I'm all bricks, cement and stone, that my lord and lady's little one was transformed that night from a jean clad college graduate to a fairy tale princess in her wedding finery. Her luminous eyes held I know not what human emotions, love or fear?

After their daughter's marriage the parents missed her so but consoled themselves that she was happy in her new home. As was the pre- marriage agreement their daughter started returning to me, this parental home every few months for completing her studies. During those visits I saw that she had changed as she pined quietly for her new mate and at the same time struggled late into the night to reach her academic goal. But strange are the ways of men! Her groom and his family misunderstood her frequent absences as dissatisfaction of her new in-law family and grew suspicious of her academic pursuits thinking of them as cover-ups for extramarital alliances. What an irony! The sparkle and charisma that had drawn so many admirers to the dear girl, only served in flinging her own true mate far away from her! On her monthly visits I used to hear her pleading with her new love long into the night on the phone or saw her pouring her eyes and heart out on paper, penning long letters, while working on her doctoral dissertation. And then one day she returned to my door with a large suitcase and a heavy book bag and shut herself up in her pink room.

I'm sure my room was the same as it was when she was a child, but was it able to bring her childhood innocence and security back to her?

The parents, I could see and hear, didn't approve of their new son-in-law's unnecessary suspicions and his insistence on their daughter to stop her PhD studies. But at the same time they couldn't wholeheartedly agree with their daughter's drastic decision to leave her new home either. It was a fretful, unhappy time and I hope I was able to give the parents and especially their daughter, the refuge and shelter that I have always tried to provide. I heard the little dear tell her parents in a tremulous voice that if he cared enough he would surely come ring my door bell and get her back home. I do admire her strength and courage though, as she decided to continue her studies and academic dreams while she waited. I've heard her so many times sing on her piano or sit late into the night on the third floor terrace, trying to convince her lonely self that if someone believed in her, trusted her and above all loved her, that someone would surely respect her dreams and return to make her his own. She wrote poems, read them at crowded recital halls and sang her life away. She poured over her books, spent hours at her university library, much to the distress of her already distressed parents, presented numerous research papers and received academic accolades.

I saw her run to my front door at every bell, wait by the phone for days but no one called, no one came. Finally one rainy day, a little more than a year after the huge wedding celebration, my master and his daughter went somewhere with serious, sad faces. They came back looking even more serious and sad. The daughter went into her pink room holding a signed and sealed court paper of divorce. She opened the last shelf of the bookcase and stuffed her wedding album and the marriage annulment papers all the way in the back.

The bookcases stands shut and secretive even now. I can't remember my lord and lady ever pulling out favorite editions of poetry or novels from that book case as they used to do before. The joyful family that had lived within my walls somehow seemed to wither. My landlord, I noticed suddenly one day, had developed a stoop. My lady started staring blankly at her fine boned face in the dresser mirror probably wondering why the wrinkles wouldn't stop chiseling her face even more. The daughter stayed away from home as much of the day as she could pursuing her academics with feverish intensity.

A few months later I found that the daughter was making frequent trips to the front letter box to check every mail delivery. Was she waiting for someone to write to her? Maybe she was! About an year later a young man in jeans and shirt showed up at my front door. I saw through the summer breeze-stirred window curtains of my living room, a man with upright shoulders and strong moves. I heard his direct comments and merry laugh as he chatted easily with my lady and lord. Did the daughter peek in sometimes with a shy smile and a cup of tea for the new guest? I've heard there is a saying among humans, “He came, he saw, he conquered!” I found out later that he was the man our daughter was exchanging letters with for he lived in a faraway land where she also wanted to go for further studies.

I knew from the conversations of the daughter with her parents that this earnest young man was visiting her at the university every day, waiting for her to be done with her teaching assignments, before taking her out to the Book Café for a bite and a quick coffee. Maybe this was what humans call a courtship. For this purposeful young man visited for a week and on the day he left, my lady's daughter was in a beautiful red sari, smiling and radiant. He walked her to her pink room, kissed her and slipped a beautiful ring on her finger before leaving.

I heard the maids saying the daughter had remarried much to the disapproval of her parents because of some strange social issues prevalent amongst humans. This time the daughter was leaving for a very distant land on the other side of the globe. I was so happy she would finally fulfil her dream of continuing academics in a prosperous foreign country. But a nagging thought kept eating into my concrete heart. Was her quick decision a fallout of her previous disastrous relationship? Did she only want to leave all this sorrow and stress behind? Was she trying to escape from the finger pointing and the ruins of her fallen dreams? Is it possible to leave one's past behind? Could she ever forget her life here with me?

I know I can't. In fact it is this past that has given me such a strong foundation that I stand as the Ashray, time keeper even today. A few years back my lord and master fell on my marble stairs and hurt his back. My lady has not been the same since then. She along with the hired help takes care of my lord tirelessly. But being the main care giver, she lost a lot of the buoyancy and independence she had developed after her daughter left. She and my master would retell stories

they never stopped repeating about how my lady had visited her daughter's new home in a faraway continent and had seen their grandson and granddaughter being born. It was their fondest memory and their surest panacea!

Their daughter and the grandkids visited when their grandson graduated from high school. I saw the precious one, my lord and lady's only daughter, now a grown woman as attractive as before and more sensitive to her parents' needs. She ran around getting everything she could find that her aged, ailing, father wanted to eat or wear. I've always known my master and her father to be a food connoisseur. She got delicious looking sweet treats, scrumptious savories from all his favorite stores. She would take my mistress, her mom, to the local farmers' market for the most delectable cuts of fish and meat, the freshest vegetables and fruit. But her visit was a short one and this family fun was short lived.

A few months after the daughter went back to her home in another continent and got busy with taking care of her own career and family, just after the biggest religious festival, Durga Puja, as they say, had passed, one day my lord never woke up from his afternoon nap. The daughter came for her father's funeral looking stunned at this sudden irreparable loss but following my lady's guidance arranged as inclusive a funeral as she could by inviting all her erstwhile family.

A little more than a year has passed since my master passed away. Since then I have seen so many new caregivers for my lady arranged by the daughter from so far away and supervised by my lady's brother who lives nearby. Now all at once everything is silent. The kitchen which was my lady's favorite haunt is quiet. No chop-chop of knives on stone, grinding of the mortar and pestle crushing spices. No pressure cooker whistles, no sizzle of fish or vegetables in hot oil. No magazines or flowered diaries flutter their open pages on the dining table where my lady read and wrote during the long, humid afternoons. For the last few months I have not seen my lady light the evening lamp in her shrine or even talk to her husband, my lord's beautifully mounted picture as she used to do every morning. In fact I was surprised to see her daughter come and clean out the house. She gave stuff away from the cupboards and her mother's antique mirrored wardrobe to all her mom's caregiver maids and friends and family.

Since then it has been very still. No mouse stirs, no clock ticks, no heart beats. There is nothing to tell time. Only the morning sun flits in through my front colored glass panes, tall and etched like a cathedral's, and slithers noiselessly up the stairs as the day goes by. Try as I might I can't find my lady in any of my rooms. She never wanted to leave me. She called me her refuge, her Ashray, her abode of peace and security. She loved me like her son, the son she never had. Where could she have gone? Did she go to meet my lord, her husband? How could she leave me without saying goodbye?

Chicago, IL

মিলি

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

ডীং ডং করে বেলটা বাজতেই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলি। ''আয় আয় ! নিলয়, প্লীজ জুতোটা, জুতোটা খুলে কিন্তু, প্লীজ'' সদর দরজা থেকে ভিতরে আসলেই যে দেওয়ালটা চোখে পড়ে তার সামনে একটা বড়ো জুতো রাখার সেলফ, আর তার লাগোয়া দেওয়ালে বড়ো বড়ো ইংরাজী আর বাংলা হরফে অভ্যাগতদের জুতো খুলে ঘরে ঢোকার সবিনয়ে অনুরোধ করা আছে, সেই দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হাত ধরে কলেজ পড়াকালীন বন্ধু নিলয় আর ওর স্ত্রী শ্রীরাধাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করি, ''বাব্বাঃ ! কত্তো দিন পরে তোদের দেখছি বলতো ? কেমন আছিস রে ?'' মুখে ক্লান্তি, কিন্তু লিপস্টিক আর আই-লাইনারের 'কেউর কঙ্কণ কুমকুম চন্দনে' পরিপাটি সাজে সজ্জিতা নিলয়ের স্ত্রী শ্রীরাধাকে এখনও এই বয়সেও মার কাটারী দেখতে আছে। ওর কোমর ছোঁওয়া ঢেউ খেলানো এলো চুলে বেগুনি রঙের হাই লাইট, শাম্পুর হাল্কা সুবাস নাকে আসে।

নিজের অজান্তে নিজের চুলে হাত চলে যায় আমার। সকাল থেকে একটু সাজগোজ করার সময় পাইনি। এক দিনের মধ্যে সব আয়োজন করতে হয়েছে, কি জানি আমায় কতটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ! হতে পারে আমার পঁয়তাল্লিশ চলছে, হতে পারে একটা উনিশ বছরের ছেলে, তেরো বছরের মেয়ে আর ছেচল্লিশের সমীরণকে নিয়ে আমার ভরা ভর্তি সংসার। কিন্তু তিন দশক আগে আমায় প্রেম নিবেদন করে ছিল যে কিশোর ছেলেটা, সেই নিলয় আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবি অন্ততঃ সুন্দর একটা জমকালো শাড়ী আর তার সাথে মানানসই কিছু গয়না পরা উচিত ছিল। কিন্তু মনে অশান্তি নিয়ে এই সব সাজগোজ করতে কার ভালো লাগে ? গত এক সপ্তাহে বহুবার ভেবেছি, দূর ! ওদের ডেকে বলে দিই, অসুবিধায় পড়ে গেছি, নিমন্ত্রণ খারিজ। এমনকি গত কাল অবধি ওরা শেষ পর্যন্ত আসে কিনা, এই নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তার ছাপ মুখে পড়তে বাধ্য। আমার সাথে নিলয় স্কুলে পড়েছে, তার পরে সমীরণের সাথে মাস্টার্স, আবার আমার সাথে কলেজ পড়লেও শ্রীরাধা আর সমীরণ এক স্কুলের সহপাঠী ছিল, সিনেমাতেই সচরাচর এই রকম ক্রস কানেক্সন দেখা যায়। হঠাৎ করে ফেসবুকে ওদের দেখতে পেয়ে যখন আমি আর সমীরণ নীলয় আর শ্রীরাধাকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে ফেলেছি, মিলিও সমান্তরাল ফেসবুকের মাধ্যমে সেই একই সন্ধ্যায় ওর প্রিয় বান্ধবী এমিলির বাড়ি রাতের খাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে গেল। গন্ডগোলটার জটিলতা বাড়িয়ে মিলি জানাল যে শুধু মিলিই নয়, আমি আর সমীরণ আর অন্য সব কটা বাচ্ছার বাবা মায়েরাও নাকি আছি এমিলির বাবা মায়ের গেষ্টের লিষ্টিতে। মিলির ভাষায় এটা নাকি একটা ''এপিক গেট টুগেদার'', যার সম্ভাবনা একটা মানুষের জীবনে বেশি আসে না, এবং এটার সদ্ব্যবহার করা উচিৎ আমাদের। জানতে পারলাম এমিলির বাড়ির এই নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করা মানে এমিলিকে অগ্রাহ্য করা এবং শুধু এই কারণেই মিলির বন্ধু মহলে আমার আর সমীরণের নাম লজ্জার প্রদর্শনী বা 'হল অফ শেম' এ চলে যেতে পারে। আমাদের কি উপায় হবে ! আমি মিলিকে বললাম আমি আর সমীরণ এমিলির বাড়ির নিমন্ত্রণ নিচ্ছি না, কেন না আমাদের নিজেদের বাড়িতে আমাদের দুজনের দুইজন ছোটবেলার বন্ধু-বান্ধবী আসছে অনেক দিন পরে, শুধু তাই নয়, আমার ইচ্ছে নেই মিলিও যাক এমিলির বাড়িতে। সমীরণ একটা একুল-ওকুল দুকূল রাখা সমাধান দিয়েছিলো। মিলি যাক ওর বন্ধুর বাড়ি, আমরা না গেলেই তো হলো ! কিন্তু সেটা একেবারেই আমার না পসন্দ। এতদিন বাদে ছোটবেলার বন্ধুরা আসছে, আমাদের ছেলেমেয়ের সাথে আলাপ না করলে, ওদের না দেখলে বা চিনলে কেমন করে চলবে ? বিশেষতঃ আমার এমন সুন্দর বাংলা বলা রামায়ণ-মহাভারত-হোমার-ওডিসি - জানা আমেরিকান ছেলেমেয়ে ! আমার ইচ্ছা মিলিও থাকুক আমাদের সাথে, আমাদের অতিথি আপ্যায়ণে। ব্যাস ! লেগে গেছিল কুরুক্ষেত্র, মায়ে মেয়ের অধিকার - দাবীর লড়াই।

নিলয় আর শ্রীরাধাকে আমাদের বাড়িতে ডাকা নিয়ে মিলির ঘোরতর আপত্তি। কখনও তার মুখ ভারী, কখনও আমার সাথে তুমুল কথা কাটাকাটি। কখনও নানান জটিল

প্রশ্ন । বড়ো হওয়া বলতে কি বোঝায় ? তার এক্তিয়ার কতখানি ? এই নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক । যে টাইফুন-প্রশ্নটা এই তর্ক থেকে উঠে এসেছিলো তা হলো, এই বাড়িতে কার অগ্রাধিকার ? মেয়ের বন্ধুর নাকি বাবা-মায়ের বন্ধুর ? গত ছয়দিন মিঠু আর সমীরণ এই লড়াইটা দূর থেকে দেখেছে, নিরপেক্ষ ভাবে । সমীরণ দিয়ে হবে না, আমি শেষে মিঠুর শরণাপন্ন হলাম । প্লিজ মিঠু, বোনকে একটু বোঝাও'' । হলোও তাই, মিঠুর মধ্যস্থতা আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য কাজে লাগলো । গত কাল দাদার সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরে নিজের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে মিলি জানালো ও থেকে যেতে রাজী । সমীরণ সব শুনে বলল, ''পারো বটে তুমি'' ।

তার পরের দশ ঘন্টা আমি অতিথি আয়োজনে কাটিয়েছি ।

'' আয় আয়, রাস্তায় কোন অসুবিধে হয়নি তো ?''

''নাঃ ! ঠিক খুঁজে নিয়েছি । আমার মিস ভ্যান্তারা, থুড়ি থুড়ি কি যেন . . . . ইয়াপ, বলাকাকে বিয়ে করেছে আমার প্রানপ্রিয়া শ্রীরাধিকের লস্ট লাভার, তাদের বাড়ি আসার সুযোগ পেয়েছি ! হারিয়ে যাবো ? বাওয়া, আমি কলকাতার ছেলে । দুটো চারটে শহর পার হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়ি আসতে অসুবিধে হবে ? কি যে বলিস ! সেই কবে কবি নজরুল বলে গেছেন It is a small world after all'' জুতোটাও ছাড়েনি তখনও, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই নিলয় কথা চালিয়ে যাচ্ছে । ওর উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে যে পরিবর্তন সেটা বয়সের গুণ, কপাল বেড়ে গিয়ে মাথার অর্ধেকের বেশী দখলদারি নিয়েছে, সেটাও বয়সের দোষ, চশমা, ওর সেই স্কুল থেকেই ছিল । আমেরিকায় এসে ওর সাহেবী-আনা আরো অনেক গুণে বেড়েছে । রেব্যানের রীমলেস ফ্রেম, ভারসাসের হুডওয়ালা সোয়েটার, ইয়াপ্লোসের কালো জুতো কিন্তু মানুষটাকে পাল্টাতে পারেনি । ''কি রে, সমীরণ কোথায় ? দেখি তার চেহারাটা ?''

শ্রীরাধা নিলয়কে কনুই দিয়ে হাল্কা একটা ঠেলা দেয়, ''নীল ! কি হচ্ছে বাচ্ছারা শুনছে'' । ওর মৃদুস্বরে প্রতিবাদ-বিহীন প্রতিবাদের মতো একটা কিছু শুনতে পাই । আমার পিছনে ছেলে মিঠু দাঁড়িয়ে আছে দেখে বুঝি ওর মনে হয়েছে প্রতিবাদ না করলে খুব বাজে দেখাবে; ''শ্রীরাধা তুই এখনো কলেজ পড়ুয়া শান্তশিষ্ট গুডি টু - শু রয়ে গেছিস ? আরে বাবা, আমরা ইয়ারকি - ঠাট্টা বুঝি !''

''ওঃ ওই ছেলেটা ? ওর জন্য চিন্তা নেই, ও কিছু বুঝবেনা, ও আমেরিকান না ?'' নিলয় পারলে আমার ছয়ফুট লম্বা, একশো সত্তর পাউন্ডের মিঠুকে স্রেফ ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দেয় । মিঠু মাথা নাড়ে, ''ঠিক ! অল কুল, তোমরা ঘরে বসে গল্পগউজব করো আমি আসছি একটু'' ।

''ওকে । বাই, হ্যাভ ফান, সি ইউ সুন'', মিঠুর কাঁধে হাত দিয়ে ওকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসে নিলয় । তারপর বসার ঘরে সোফার ওপর সশব্দে বসতে বসতে বলে ''তোর ছেলেটা ভাল বাংলা বলে, একটু বিদেশি টান, বাট দ্যাটস ফাইন'' ।

ছোট বেলা থেকেই ছেলে - মেয়ে দুইজনেই ক্লাস ফোর থেকে হাইস্কুল ওঠা অব্দি প্রতি গরমকালের ছুটির তিন মাস কলকাতায় আমার শাশুড়ির তত্ত্বাবধানে কাটিয়েছে । তিনি কলকাতার মর্ডান - হাই স্কুলের বাংলা ভাষার শিক্ষিকা ।

''যাওয়ার সময় তোর ছেলেটা চুপিচুপি আমায় কি বলল জানিস ?''

''কি করে জানব ? তুই তো বানাচ্ছিস গল্প, তুই বস আমি চায়ের জল বসাই'', আমি রান্না ঘরের দিকে এগোই । ''বাণী আরে শোন না ! চা পরে হবে, আমার প্রশংসা করে গেলো, বলে কি না, তুমি এতো হ্যান্ডসাম, ক্যারিস্মাটিক, মায়ের চয়েস ভালো ছিল তো, হঠাৎ কলেজে উঠে বাবার সাথে লটকে যাওয়ার কারণটা কি ?''

''ওমা ? তাই নাকি বলাকা ! তলেতলে এই সব ?'' শ্রীরাধা ব্যাগ থেকে ছোট একটা চিরুণি বার করে চুল আঁচড়াচ্ছে, আয়না থেকে মুখ সরিয়ে আমার দিকে তাকায় । ''যাহ, হতেই পারে না !'' আমি হই হই করে উঠি ।

''বাঃ, ঘর বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিস, ভ্যান্তারার উন্নতি হয়েছে তা হলে ! কিরে শম্বুককে ডাক দে, কোথায় সে ? ধীরে সমীরে চঞ্চল নীড়ে সমীরণ, সে কি লুকিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি ?''

গ্যারাজের দরজা খোলার শব্দ পাই, ''ডাকতে হবে না আসামী হাজির !'' সমীরণ ঘরে ঢোকে । দুই হাতে তাজ-ইন্ডিয়ানের প্যাকেট । সিঙ্গারা-কচুরি-ধোকলার গন্ধে ঘর ভরে যায় ।

দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি এসে বসার ঘরে মিশেছে, তার পাশেই বাড়ির সদর দরজা । মিলি বেলের আওয়াজে নিজের ঘর থেকে নেমে এসে সিঁড়ির রেলিঙের ওপর এক পা

তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাড় উঁচু করে দেখছে, আমাদের কথাবার্তা শুনছে । আমি মনে মনে গুরুদেবের নাম জপ করি ।

মিঠু বরাবর ঠান্ডা মাথার, বয়সের তুলনায় পরিণত, মিলির সাথে আমার কথা কাটাকাটির চূড়ায় মিঠুর বাচন-ভঙ্গি ছিল দেখবার মতো । ''ওঃ'' বুঝেছি, রেল্লা নেওয়া ! আগে বলবে তো ? আগে বলবে তো ? বোনু ! সেই কিন্ডারগার্টেনে শো এন্ড টেল হতো না ? বাড়ি থেকে নানা জিনিষ নিয়ে গিয়ে ক্লাসে সবাইকে দেখানো আর তাদের সম্বন্ধে বলা ? দেখাও আর বলো ? মা ওর বন্ধুদের কাছে আমাদের দেখাতে চায়'', আমায় আশ্বস্ত করেছিলো, ''মা, আমি বোনুকে বোঝাচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না' । মিঠু বোনকে নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে গিয়েছিল । ফিরে এসে আমাকে বলেছিল 'সবুজ বাতি; অল গুড' ।

নিলয় আর শ্রীরাধার থেকে নজর সরিয়ে রেলিঙের দিকে তাকাই, মিলির সাথে আমার এক লহমার দৃষ্টি বিনিময় হয় । ওর মুখে একটা কৌতুহলী হাসি ফুটে আছে । কি জানি বাবা কতক্ষণ থাকে, বলা যায় না কোন কথা থেকে ফস করে আগুন জ্বলে উঠবে, ''মামি বাই, এঞ্জয়'' বলে ধাঁ করে বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাবে, নিলয় আর শ্রীরাধার সামনে আমার প্রেস্টীজের ফুলবাগান থেকে ধাপার মাঠের গন্ধ বেরোবে । নিলয় আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মিলিকে দেখে, ওর বিখ্যাত ডনবক্সীয় কায়দায় হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ায়, কিন্তু তার আগেই মিলি রেলিং বেয়ে এসে টিপ টিপ করে ওদের দুইজনকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলেছে ।

''আরে ব্যাস !'' নিলয় দুই হাতে ওকে ধরে ফেলে, ''করেছিস কি ? এই সব আবর্জনা শিখিয়েছিস !'' ''না না আবর্জনা কেন বলছো, এটা তো ভালো একটা রাজনীতি, . . . না,'' মিলি এক সেকেন্ড থেমে মাথা চুলকায়, ''ভালো একটা রীতিনীতি ।''

আমি কছু বলার আগেই শ্রীরাধা হিহি করে হেসে উঠেছে, ''নীতি বললেই চলবে, তার আগে রাজ কিম্বা রীতি বলার দরকার নেই'' ।

''এটা কতো ভালো হলো !'' মিলি রাগত চোখে আমার দিকে তাকায়, ''মা আমার বাংলা ভুলগুলো বলে না, ও মজা পায়'' । আমরা সবাই এবার হাসি । ''যা তুই, হোমওয়ার্ক করগে যা, বড়োদের মধ্যে থাকতে হবে না !''

মিলি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাটকীয় সুরে বলে ওঠে, ''হোমওয়ার্ক নয় জননী, বাড়ির কাজ !'' ''যা ভাগ !'' আমি তাড়া দিই ।

''আহ থাকুক না,'' নিলয় বলে ওঠে ।

''না কাকু, তোমরা বড়োদের গল্প করো, আমি থাকলে হবে না,'' মিলি আমার দিকে আড়চোখে তাকায় ।

''দূর ! মায়ের কথা শুনতে হবে না, আয় তুই'' হাত ধরে ওকে নিজের পাশে বসিয়ে নেয় শ্রীরাধা, ''আয় তো !''।

আমরা জমিয়ে বসি । চা সিঙাড়া খেতে খেতে অতীত আলোচনায় আমাদের পরস্পরের চেনা সতীর্থের পরনিন্দা পর-চর্চায় মেতে উঠি । ''এই মনে আছে জলির কথা ? তখন ক্লাস টেন আমাদের'', আমি শুরু করি, ''ক্লাস টুয়েলফের সুদীপ ওকে প্রপোজ করাতে ও কি বলেছিল ?''

''মনে নেই আবার ?'' নিলয় উঠে দাঁড়িয়ে সাবেকি মেয়েলী ঢঙ্গে আঙুলে কাল্পনিক শাড়ির আঁচল পাকাতে পাকাতে বলে, ''না না হবেনা মা বকবে, তুমি বড্ডো ফরসা'' ।

সমীরণ এই গল্প বহুবার শুনেছে, ও কাঁধ উঁচু করে সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিলয়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাতর গলায় বলে ওঠে, 'প্লীজ একটা চান্স, আমি তোমার জন্য রোদে দাঁড়িয়ে কালো হবো, প্লীজ'' ।

মিলি খিলখিল করে হেসে ওঠে, ''সিলি গুজ ! রিয়ে . . . সত্যি ?''

''হ্যাঁ রে,'' নিলয় চোখ বোজে, ''কি সব দিন গেছে !'' ।

''আচ্ছা কাকু, আমি একটা কথা ভাবছি, তুমি, মাকে ভ্যনতা নাকি একটা বললে ? ওটা কি মায়ের নাম ছিল ?''

''হ্যাঁ । ভ্যান্তারা । ইন্ডিয়াতে স্কুল-কলেজে প্রায় সবার একটা এক্সট্রা নাম হয়ে যায়, চলাফেরা স্বভাবের ভিত্তিতে । টিচার, স্টুডেন্ট, অফিসিয়াল, কেউ বাদ পড়ে না । কারোর নাম না থাকাটাই রেয়ার, বিরল । তোর মা, সব কিছু নিয়ে এতো ইয়ে করতো, যাকে বলে'', নীলয় হাসছে, ''পেটে আসছে কথাটা, মুখে আসছে না, দাঁড়া । হ্যাঁ ইন্ট্রোডাকসন .., ভনিতা, সেই থেকে ওর নাম ভ্যান্তারা হয়ে গেলো ।''

''মাসী ? তোমারও নাম ছিল ?''

''হ্যাঁ . . .'' শ্রীরাধার মুখ উজ্জ্বল, ''বাউল, আমি খুব ভালো গাইতে পারি না তো, স্কুলের ফাংশানে গাইতাম।''

''কলেজে উঠে ওটা হয়ে গেল বাদু বাউল। বাউলটা ছিল অনেকটা টাইটেলের মতো, আসল নামটা বাদু বাউল'' সমীরণ কচুরিতে একটা কামড় লাগিয়ে আলতো করে বলে দেয়। ''কই আমি জানতাম না তো !'' শ্রীরাধার রুষ্ট কণ্ঠ। ''এই . . .'' বলে আমি চিৎকার করে উঠি, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে মিলি কথাটা শুনে ফেলেছে এবং সমাধানও করে ফেলেছে, ''ও মাই হোলি হেইসুস মাসি ! বাদ উ বাউল, মাসি এটা একটা পাযল মানে ধাঁধা। ওই যে আছে না ? লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া, পাগল ছাড়া পা, সেই রকম ! উ মাইনাস বাউল, এবার তুমি বুঝে নাও। পুওর থিং ! হোলি রঙ্গোলি'' মিলি পাগলের মতো হাসছে।

শ্রীরাধা হাতের মুঠি তুলে সমীরণকে মারতে ওঠে, ''শয়তান, আয় দেখাচ্ছি তোর মজা'' সমীরণ উঠে সোফার আড়ালে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে, ''সত্যিকারের মজা ? রাধিকে ? আসুন দেবী, দেহি পদপল্লব মুদারম !''

''চেপে যাও মাসি, চেপে যাও'' মিলির হাসি আর থামে না।

আমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় নামি, ''চলো এবার টেবিলে গিয়ে বসি, রাতের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক, তার পরে না হয় আবার মুষ্ঠিযুদ্ধ হবে।'' মিলির কাঁধে হাত রেখে রান্নাঘরে আসছে নিলয়। ''এই দেখ, এত যে সব নাম শুনছিস। তোর বাবা ? শম্বুক, শামুক স্নেল, সব কিছু এতো আস্তে ধীরে। তোর মায়ের নাম, এই মাসিটার সবার একটা ফাউ নাম, অথচ আমি ? ব্যাস নিলয়, সংক্ষেপে নীল।''

''বাহ !'' মিলি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, ''সেটাতো একটা বিরাট ব্যাপার ! তাই না ?'' ''হ্যাঁ, দারুণ ব্যাপারই তো। সেই ছোটবেলা থেকেই আমার পার্সোনালিটিই এমন !'' বেশ জোরের সাথে কথাটা বলে নিলয় গর্বের হাসি হাসে। সমীরণ আর আমি পরস্পরের দিকে তাকাই, নিলয় - শ্রীরাধার দৃষ্টি এড়িয়ে সমীরণ ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে আমায় চুপ করে থাকার ইঙ্গিত দেয়। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। তখন জানতাম না আমাদের এই ভাব-বিনিময় মিলির শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। আরো অনেক কিছুই তখন জানতাম না।

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে আয়োজন দেখে নিলয় আর শ্রীরাধা রীতিমত সোরগোল ফেলে দেয়। এতো খাবার ? কে খাবে ? এলাহি ব্যাপার, এক পল্টনের খাবার ! প্রচুর থেকে যাবে ! ইত্যাদি ইত্যাদি।

''বারে ! করবো না ? কতোদিন পর তোদের দেখলাম, এই যে তোরা ছেলেবেলার বন্ধু আমার রান্না নিয়ে হই হই করছিস কি ভালো লাগছে !'' মনে মনে ভাবি সপ্তাহে একদিনই রান্না করি, পরের শনিবারের আগে আর রান্নাঘরের পথ মাড়াচ্ছি না।

কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করি মিলি রান্না ঘরে সবকিছু ঘুরে ফিরে দেখছে, সাজানো এ্যলুমিনিয়ামের ট্রেগুলো মেপে দেখছে যেন। কেমন একটা উসখুস করেছে, কি একটা ভাবছে। তারপর হঠাৎ আমার কাছে এসে ভীষণ আন্তরিক ভাবে প্রস্তাব দেয়। ''মা, এ্যলুমিনিয়ামের ট্রেতে এই ভালো খাবারগুলো বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, আমি প্রয়োজনমতো খাবার তোমার কাঁচের আলমারিতে রাখা চায়নার বাসনগুলোতে তুলে দেবো ?''

''ঠিক বলেছিস ! ভীষণ খুশী হবো'' শ্রীরাধা উচ্ছসিত, ''বাবা মিলি তো খুব কাজের !'' শ্রীরাধাকে সাথে সাথে ধন্যবাদ দিয়ে মিলি ওর ব্রহ্মাস্ত্র আহ্লাদি গলায় এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়, ''মা . . ., এতো খাবার আছে, অনেক এক্সট্রা, আমি কি সুসানকে ডাকতে পারি ?'' ''নিশ্চই'', আমি না ভেবেই উত্তর দিয়ে দিই।

মিলি আমার দিকে সন্তর্পণে তাকায়, ''আসুলি, আমি সুসান আর মলি দুটোই ভাবছিলাম . . . প্লীজ''। ''হ্যাঁ ঠিক আছে রে''। আমার ভাবটা যেন এটা আর জিজ্ঞেস করার কি আছে। একটা ছোট্ট থ্যাঙ্কস বলে মিলি দৌড়ে দোতলায় ওর ঘরের দিকে চলে যায়। কিন্তু চার পাঁচ মিনেটের মধ্যেই আবার ওর উদয় হয়। আবার কি হলো ?

মিলি সমীরণের একবারে গাঁ ঘেষে দাঁড়িয়ে, ''বাপী-মা, তোমাদের দুজনকেই প্রশ্নটা, আমি কি দুটো ছেলে, মানে জন আর ম্যাথুকেও ডাকতে পারি ?'' এইসব ক্ষেত্রে সমীরণের স্ট্যানডার্ড উত্তর ''তোমার মা যা বলেন'' বলার আগেই আমি বলে দিই, ''হ্যাঁরে'' তারপরেই খেয়াল হয়, ''কিন্তু ওরা বসবে কোথায় ?''

''কেন বাইরের ঘরে ডেন এ ? আই মিন বাবার ছোট্ট ঘরটাতে, তোমাদের একটুও বিরক্তি হবেনা, আমি ভাল করে দরজা বন্ধ করে রাখবো।''

মিলি ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের জন্য খাবার ভালো

চায়নার বাসনে তুলে দিয়ে, একটা একটা করে সব কটা এ্যলুমিনিয়ামের ট্রে বাইরের ঘরে নিয়ে যায় । ''ডিস ? জলের গেলাস ? চামচ ?'' আমার প্রশ্নগুলো মুখ থেকে তখনও ভাল করে বের হয়নি, দরজায় বেল । ''তার জন্য চিন্তা নেই, ওরা নিয়ে আসবে'' মিলি দৌড়ে গিয়ে সদর দরজা খোলে ।

বসার ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরকে বাড়ির প্ল্যানে রাখার বুদ্ধিটার জন্য সমীরণকে ধন্যবাদ দিই । আমাদের বাড়িতে ওটার নামই হয়ে গেছে বাবার ছোট্ট ঘর । নিলয়-শ্রীরাধার চোখে মুখেও স্বস্তি । ভালোই হলো ।

খেতে বসে আমরা জয়ললিতা, শারদ পাওয়ার, মমতা ব্যানার্জীর গুষ্টির তুষ্টি করি । সবে তাপস পাল আর অভিষেক ব্যানার্জীকে নিয়ে একটা কড়া মন্তব্য করব, আবার কলিং বেল ।

ডেন থেকে যা কলকাকলি আসছে, মিলি শুনতে পেয়েছে কিনা কে জানে, আমিই উঠি । গ্যারী, জর্জ আর সমান্থা । ওদের হাতে একটা বাজারের থলে আমার নজর এড়োয় না ।

''হাই ! মিলি ?''

''এই যে'' ডেনের দরজা খুলে চট করে পাশে সরে আসি, পাছে আবার ওরা না ভাবে মিলির মা উঁকিঝুঁকি মারছে । ''এইখানেই সবাই আছে'' । বলার দরকার ছিলো না, উত্তেজিত কলরোল ভালোই শোনা যাচ্ছে, ওরা নিজেদের গলার স্বর চেনে !

''হ্যাঁ, যা বলছিলাম . . .,'' আমার অবর্তমানে নিলয় কন্ডি রাইসের তুলোধোনা শুরু করেছে, আমিও কিছু বলবো, আবার বেল । উঠে গিয়ে দরজা খুলতে আরো চার জন ।

''হ্যালো ! মিলি ?''

''হ্যাঁ, এই যে''

চেয়ারে এসে বসি, শ্রীরাধা বলে ''দরজাটা খুলেই রেখে আয়'' । আমি অপ্রস্তুত হাসি, চিন্তাটা আমার মনেও এসেছে । আবার বেল, হ্যাঁ আরো তিন জন ।

নেতাজী রহস্য আবার সংবাদ শিরোনামে ।

মিলি এসে আমায় চুমু খেয়ে ফ্রীজের সামনে দাঁড়ায়, ''মা, ফ্যান্টাস্টিকো ! দারুণ রান্না করেছো, আমি কি একটু আইসক্রীমের টাবটা ডেনে নেবো ?'' নিলয় আমার হয়ে উত্তর দেয়, ''সিওর'' ।

পাশের ঘরের হল্লাকে অগ্রাহ্য করে আমরা শৈশবচারণা, রাজনীতি থেকে বর্তমানে চলে আসি । নিলয়-শ্রীরাধার দুই মেয়ের একজন ইঞ্জিনীয়ার, অন্যজন আইনজীবি, কাজ আর নিজেদের সংসারে ব্যস্ত ।

''এবার উঠিরে, প্রায় বারোটা'' নিলয় হাই তোলে, ''এইবার তোরা আয় আমাদের বাড়ি, এইতো উইস্কনসিন বর্ডার পেরিয়েই, রাতে থাকার প্ল্যান নিয়ে আসিস কিন্তু'' । মেয়েকে ডাক দিই, ''মিলি ওরা চলে যাচ্ছে !''

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর সাড়া পাই, ''ওয়েট . . ., আমার বোন্দুসরাও বেড়োবে'' ।

মিলি অনেক ছোটবালা থেকেই ফ্রেন্ডস এর বাংলা বোন্দুস করে নিয়েছে । শ্রীরাধা চোখ টিপে হাসে, ''তাড়া নেই, বোন্দুসদের জন্য আমরা ওয়েপেক্ষা করছি'' ।

বাইরের ঘরের দরজা খুলে একে একে মিলিটারি কায়দায় সারি সারি লাইন দিয়ে আমাদের সামনে চোদ্দজন ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে । মিলি একটা করে নাম বলে নিলয় আর শ্রীরাধার সাথে পরিচয় করায় । ওরা আমাদের সবাইকে হাই বলে, খাবারের আর আমাদের আতিথেয়তার প্রশংসা করে রাস্তায় বেরোয় । ছকে বাঁধা যেন ।

হচ্ছেটা কি ? এই বড়ো প্রশ্নটাকে দমিয়ে রাখি, একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে, সমীরণের দিকে তাকাই, ওর নির্বিকার মুখে কোন সাহায্য নেই । ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটা ধরা সময়ে মিঠুর মুখ দরজার সামনে; বোনের মেয়ে-বন্ধুদের গালে চুমু খেয়ে, ছেলে বন্ধুদের গালে পিঠে চাপড় মেরে অমিতাভ বচ্চন ঘরে ঢুকলেন । নিলয় শ্রীরাধাকে গভীর আলিঙ্গন দিয়ে মিঠু সবাইকে বিদায় জানায়, ''আবার এসো কিন্তু'' দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা । আমি চটজলদি টাইগার - মাম এর টুপি পরে নিই, ''এই মিলি ? কি ব্যাপার বলতো ? তোর সব বন্ধুগুলো এখন আমাদের বাড়িতে কেন ? কি করতে ? ওদের তো আজ এমিলির বাড়িতে থাকার কথা ?

''ও মা ! আমি তো তোমার অনুমতি নিলাম, ওরা এসেছিলো ডিনার খেতে ! এমিলির মা অনেকগুলো স্ন্যাক্স, চিপ্স, প্রেটয়েল আর জেলো রেখে ছিলো । ওদের পেট ভরেনি'' ।

''এমা ছিঃ ছিঃ, এটা কি করলি ? এমিলি যদি জানতে পারে ? তোর এতো দিনের প্রিয় বন্ধু, কি ভাববে বলতো ? ছিঃ'' । মিলি আমার অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়, ''কি ভাববে ? কেন কি ভাববে ? এমিলিও তো আমাদের বাড়িতেই ডিনার খেলো !'' ওদের বাড়িতে স্ন্যাক্স আর আমাদের বাড়িতে ডিনার আর ডিযার্ট, আইসক্রীম'' ।

সমীরণ আর মিঠু হো হো করে হাসছে সম্ভবতঃ আমার মুখের অবস্থা দেখে । আমি বলি ''এর হোতাটা কে ? প্ল্যানটা কার ? দাদার না বাপীর ?'' মিলি বলে, ''ওয়েল, দাদা আর বাপী দুইজনেই সমান দায়ীত্ব । ইটস শো এন্ড টেল মাদার ! তোমার বন্ধু আমার বন্ধু, দাদার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল . . . পারদর্শিতা, তোমার রান্না, বাপীর আতিথীয়তা । অল পার্ট অফ ইট । শো এন্ড টেল, দেখাও আর বলো'' ।

আমায় বাকশূন্য দেখে ওরা তিনজনে হেসে কুটোপাটি খাচ্ছে, কি করি ?

পঙ্গপালের দল ঘুরে গেছে ধানের ক্ষেতে । বাইরের ঘর থেকে চাঁটাপোঁটা খাবার ট্রেগুলো এক জায়গায় গুছিয়ে জড়ো করি । আইসক্রীমের টাবটা দেখে খুশি হই, ভুল করে এই বড় টাবটা কিনে ছিলাম, শুধু আমাদের ব্যবহারে শেষ হতে দুবছর ঘুরে যেতো ।

''কিন্তু বাপী ! সিরিয়াসলী ! এই নিলয় কাকুর ? ও ভূতের ভবিষ্যতের পোমদ প্রধানকে নকল করছিলো, আরো অনেক কিছু মজা মজা করছিলো, এই নিলয় কাকুর কোন ফাউ নাম ছিলো না ?''

''ছিলোরে ছিলো, বললাম না । তোর কাছে রেল্লা করছে, তাই আর হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলাম না, ওর নাম ছিল বিচিত্র বীর্য'' ।

''এই যাঃ'' আমি চিৎকার করে উঠলে কি হবে, সমীরণের মুখ ততক্ষণে খুলে গেছে । ''কি একটা পেন, আমেরিকা না জাপান থেকে কে জানে, ও কোথা থেকে জোগাড় করে ছিলো । সবাই দেখতে চাইছে, লিখতে চাইছে, ও বলে নাঃ ফুরিয়ে যাবে, বহু কষ্ট করে পেয়েছি পেনটাকে । তারপর সবাইকে দেখিয়ে খুব কায়দা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রেখেছে । সারাদিন গেছে, আমেরিকান পেন কলকাতার গরমে লীক করেছে, আর ব্যাস ! দিনের শেষে একটা নীল-বেগুনি রঙ পকেট থেকে বেরিয়ে, প্যান্টের বিভিন্ন যাকে বলে স্ট্র্যাটেজীক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে . . ., আর সেই থেকেই ও হয়ে গেল বিচিত্র বীর্য ।''

সমীরণ আর মিঠু ঠা ঠা করে হাসছে ।

মিলি তিন-চার সেকেন্ড ভাবতে সময় নেয়; বাংলা ভাষার ওপর বুৎপত্তি ওর যথেষ্ট, বিচিত্র বীর্যের সমাস করতে বেশী সময় লাগে না । ওর হাসিটা অন্যরকম, প্রথমে খিল খিল দিয়ে শুরু করে ও দমকে দমকে হাসছে, বুঝতে পারি ও কল্পনায় নিলয়ের পরিস্থিতি করছে । ''কিন্তু, কিন্তু বাপী ? ওকে তুমি ফাঁসিয়ে দিলেনা কেন ?''

''ওই যে তুই এখনি বললি না ? অল পার্ট অফ শো এন্ড টেল । ওকেও আমি একটু সুযোগ করে দিলাম রেল্লা নেওয়ার, ছেড়ে দিলাম'' ।

মিলি মাথা নাড়ে । ''মেবি, হয়তো, আমি বুঝেছি এবার । একেই বলে বড়ো হওয়া'' ।

শাশ্বতী যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী । কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স ডিগ্রী করে সি এস আই আর (CSIR) এর স্কলারশীপে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটুট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজিতে পি এইচ ডি র কাজ করেছেন । মেরিলান্ডের ন্যশানাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে পোস্ট ডঃ করে এখন ইউনিভার্সিটি অফ উইস্কনসিন ম্যাডিসনে সায়েন্টিস্ট । ওর নিজের ভাষায় ''ব্রেস্ট ক্যান্সার গবেষণায় ব্যস্ত আছি, স্বস্তি নেই । আনন্দ আছে কিন্তু প্রফুল্লতা নেই ।'' ওর জীবনের অল্প কয়েকটা আফসোসের একটা হল, সায়ন্সকে জীবিকা নির্বাহ করার উপায় অবলম্বন করায় ওর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজটা একটুর জন্য হাত ছাড়া হয়ে গেলো ।

গা ছুঁয়ে বলছি মাইরি

সুজয় দত্ত

নাঃ, বড্ড সেয়ানা হয়ে গেছে মানুষ আজকাল। মিথ্যে কথা বলা (মানে 'পলিটিকালি কারেক্ট' বুলিতে যার নাম অসত্যভাষণ) যে তার চিরকালের স্বভাব, তার প্রমাণ তো মহাভারতেই আছে। কিন্তু ইদানীং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা মুহূর্তে মিথ্যে বলাকে সে এমন শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে লাই ডিটেক্টরের মতো যন্ত্রও হার মেনে যাচ্ছে। 'সদা সত্য কথা বলিবে' এই মিন্‌মিনে বস্তাপচা উপদেশবাণী এখন কলকাতা শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না'-র মতোই গুরুত্বহীন আর উপেক্ষিত শুধু নয়, অবাঞ্ছিত আর বিরক্তিকরও বটে। একটা মিথ্যে দশবার বললে সেটাই যে সত্যি মনে হয়, এ তো পুরনো কথা। এখন দেখা যাচ্ছে কুড়িবার বললে তা আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য হয়, পঞ্চাশবার বললে তা ভোটের আগে রাজনীতিকদের প্রতিশ্রুতি হিসেবে ইস্তেহারে ছাপা হয় আর একশোবার বললে তা রেডিও-টিভি-ইন্টারনেটে ভিভিআইপি-দের কোটেব্‌ল্ কোট্‌স্ বা বিশেষজ্ঞের মতামত হয়। তাহলে আর লোকে সত্যিটা বলবে কোন্ দুঃখে, শুনি ? দুনিয়ার কোনো দেশে কেউ দেখাতে পারবে সত্যি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হাসিল হয়েছে, অ্যাঁ ? একটা কোটি টাকার চিট্‌ফান্ড, একটা ভোট রিগিং, একটা গোপন স্যুইস্ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা নিদেনপক্ষে একটা বিবাহবহির্ভূত প্রেম কি হয়েছে কোনোদিন হাঁদার মতো সত্যিকথা বলে ?

ছোটবেলার সেই বর্ণপরিচয় আর নীতিকথার বই থেকে শুরু করে গোঁফের রেখা-ওঠা বয়সের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই অবধি খালি নাকিসুরে 'কঁদাঁচ মিঁথ্যা বঁলিঁওঁ নাঁ' শিখিয়ে কাগজ, কালি আর সময় নষ্ট না করে বরং শেখানো উচিত আধুনিকযুগে সাফল্যের মূলমন্ত্র — দ্য থ্রি এম্। ম্যানিপুলেট, মিস্‌লীড অ্যান্ড মিস্‌অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আরো একটা ব্যাপার আছে। আধুনিক যুগ হল গতির যুগ, তাৎক্ষণিকতার যুগ, সুপার-সনিক আর ন্যানোসেকেন্ডের যুগ। এটা তো মানতেই হবে যে সত্যির চেয়ে মিথ্যে অনেক বেশী চটপটে। স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স (যিনি আবার 'মার্ক টোয়েন' — এই মিথ্যে নামে লিখতেন) একবার বলেছিলেন না, সত্যির যখন জুতোর ফিতে বাঁধাও হয়নি, মিথ্যের ততক্ষণে আদ্ধেক পৃথিবী ঘোরা হয়ে যায় ? একদম খাঁটি কথা। সুতরাং আজকের দিনে 'অমুকে ছিলেন সত্যের সাধক' বললে তাকে আদৌ সম্মান করা হয় না ঘুরিয়ে বোকা বলা হয়, ভেবে দেখার বিষয়। এ যেন অনেকটা বুলেট ট্রেনে চড়ে যেতে যেতে কাউকে 'গরুর গাড়ীর সাধক' বা চোখধাঁধানো এল্ ই ডি লাইটের তলায় দাঁড়িয়ে কাউকে 'হারিকেন লণ্ঠনের সাধক' বলার মতো।

আর কবি-সাহিত্যিকদের তো চিরকাল মিথ্যে নিয়েই কারবার। আরে আরে চটছেন কেন ? কী লেখেন আপনি ? ছোটদের ছড়া বা রূপকথার গল্প ? 'হাটিমাটিম্ টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম' — এই ছড়াটা মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচারাল হিস্ট্রীতে গিয়ে হাটিমাটিমের প্রত্নতাত্ত্বিক ফসিল্ এভিডেন্স পরীক্ষা করে লেখা কি ? পক্ষীরাজ ঘোড়াকে ট্যাক্সোনমির ঠিক কোন্ বিভাগে ফেলা যায় ? হাঁসজারু, বকচ্ছপ বা হিজিবিজ্‌বিজ্ চরিত্রগুলোও নিশ্চয়ই ডার্‌উইনের বিবর্তনবাদ বা অরিজিন অফ্ স্পিসিসের প্রামাণ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা ? কী বলছেন, ওসব নয়, বড়দের গল্প-উপন্যাস লেখেন ? বেশ। আপনার গল্পের প্রতিটা চরিত্রের ঠিকানা আর ফোন্‌নম্বর জানা আছে তো ? তাদের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ, শেষ কবে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল — সব ঠিকঠাক বলতে পারবেন আশা করি। জানি কী বলবেন এবার — 'মহা মুশকিল তো ! মিথ্যে আর কল্পনা কী এক হল ?' ঠান্ডামাথায় ভেবে দেখুন, মিথ্যে আর কল্পনার মধ্যে আসলে কোনো তফাৎ নেই। তারা একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দ্বিতীয়টা অনেক সময়েই প্রথমটার এক গ্রহণযোগ্য, নিরাপদ মুখোশ। তা যদি না হতো, তাহলে বাস্তবজগতের কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গল্প-উপন্যাস বা চলচ্চিত্রের কোনো চরিত্রের ইচ্ছাকৃত মিল ঢাকতে আর সেই সংক্রান্ত আইনি ঝাট এড়াতে শুরুতেই অত ঘটা করে 'এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক' বলে ডিস্‌ক্লেমার দিত না লোকে। মিথ্যে আর কল্পনাকে শুধু একটিমাত্র সূক্ষ্ম ব্যাপারেই আলাদা করা যেতে পারে। তা হল তাদের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় (ইন্টেন্‌শন্)। অনেকটা

আফিম আর পোস্তর মতো। একই গাছ থেকে আসে, কিন্তু একটা মূলতঃ ব্যবহার হয় গরম গরম ভাত আর কলাইয়ের ডালের সঙ্গে স্বর্গীয় রসনাতৃপ্তি দিতে, অন্যটা মানুষের ইহজীবনকে নরক বানাতে। তবে অভিপ্রায় তো গহন মনের লুকোনো জিনিস। তাকে আগে থেকে আঁচ করে মিথ্যে আর কল্পনার মধ্যে ভেদরেখা টানা প্রায় অসম্ভব। আর এইখানেই যত সমস্যা। বিখ্যাত লোকেদের বেস্ট্সেলার আত্মজীবনীতেও আজকাল অল্পবিস্তর মিথ্যে মেশানো থাকে। আসল অভিপ্রায় নিজেকে মহান বা নির্দোষ হিসেবে তুলে ধরা আর শত্রুদের খলনায়ক বানানো। তথ্যসচেতন পাঠক বা সমালোচক ওসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেই ওগুলো তখন হয়ে যায় সাহিত্যিকের কল্পনা বা স্মৃতিবিভ্রম। ব্যস্, সাত খুন মাফ।

তবে কম্পিউটার হ্যাকার্রা যেমন লোকের অজান্তে তাদের অ্যাকাউন্টে হ্যাক্ করে ঢুকে সব ব্যক্তিগত তথ্য জেনে নেয়, তেমনভাবে যদি মানুষের মনের লুকোনো অন্দরমহলে ঢুকে তার সব অভিপ্রায় পড়ে নেওয়া যেত, তাহলে নিশ্চয়ই সত্যি আর মিথ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা এত একপেশে হতনা। কিন্তু সেটাও খুব জোর দিয়ে বলা যায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই তো আমি সেদিন তপস্যায় বসেছিলাম। আর ফলও পেলাম হাতেনাতে। দাঁড়ান দাঁড়ান, এতবড় একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেব ? নাঃ, ঠিক হবেনা। আচ্ছা আচ্ছা, এত অনুনয়-বিনয় করছেন যখন, কানটা আমার মুখের কাছে আনুন, ফিস্ফিস্ করে বলছি। কেউ জানেনা, আপনিই প্রথম জানলেন। আমি কিছুদিনের জন্য মানুষের মনের ভাষা পড়ে নেওয়ার দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলাম। আরেঃ, বিশ্বাস করছেন না ? মাইরি বলছি, গা ছুঁয়ে বলছি। কার দিব্যি দিয়ে বললে বিশ্বাস হবে বলুন, তাই দিচ্ছি। জানতে চান কী করে পেলাম ? হুঁহুঁ বাওয়া, এমনি এমনি নয়, রীতিমতো কঠোর তপস্যায়। পাক্কা দশ মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড নব্বই মিলিসেকেন্ড চোখ বন্ধ করে, একটাও কথা না বলে, একবারও স্মার্টফোনে আঙুল না ছুঁইয়ে, একবারও টিভির রিমোটে হাত না দিয়ে, একবারও ফেস্বুকে আমার লেটেস্ট সেল্ফিটা কতজন লাইক্ করল সেকথা না ভেবে একমনে দেবদেবীদের নাম জপ করলাম। আর তাতেই টলমল করে উঠল তাঁদের আসন। ধাত্তেরি, কোন্ যুগে পড়ে আছেন মশাই ? ঐসব বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে তপস্যা তো হত সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে। তপস্যা করতে করতে কেউ কঙ্কালসার হয়ে যেতেন, কারোর বটগাছের ঝুরির মতো জটাদাড়ির জঙ্গল গজাতো, কাউকে ঘিরে আবার পেল্লায় উইঢিবি উঠত। এখন তো শুধু ঘোর কলিযুগই না, এক্কেবারে কলি-টু। এখন পাঁচ-দশ মিনিটই কাফি। যাকগে, যা বলছিলাম। দেবতাদের আসন টলে উঠতেই শুনলাম স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল (মানে আমি ঠিক নিশ্চিত নই ওটা দুন্দুভি না আমার স্মার্টফোনের লেটেস্ট অ্যাপ্ যেটা টেক্সট্ মেসেজ্ এলে বাজে)। আকাশ থেকে দৈববাণী হল, 'বৎস, তোমার একাগ্রচিত্ত সাধনায় আমরা যৎপরোনাস্তি প্রসন্ন হইয়াছি। অদ্যবধি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিলাম। এতদ্দ্বারা তুমি মানবমনের সর্বপ্রকার গুপ্তচিন্তা মুহূর্তে অবগত হইবে। কেহ তোমার সম্মুখবর্তী হইলেই অবিলম্বে তাহার প্রকৃত মনোভাব ও মনোবাসনা শ্যামসঙ্গের চতুর্থ ছায়াপথের স্পর্শকাতর দর্পণের ন্যায় তোমার মনের দর্পণে প্রতিফলিত হইবে'। কী, মাথায় ঢুকল না তো দেবভাষা ? কুছ্ পরোয়া নেহি, আধুনিক বাংলিশে ট্রান্স্লেট করে দিচ্ছি। 'ব্যাটা, তোর সিঙ্গল্-মাইন্ডেড মেডিটেশনে আমরা হেব্বি খুশ হয়েছি। তোকে ডিভাইন ভিশন দিলাম, এটা দিয়ে তুই লোকের মাইন্ড্ রিড্ করতে পারবি। তোর সামনে কেউ এলেই ইমিডিয়েট্লি তার সব সিক্রেট্স্ তোর মনের পর্দায় Samsung Galaxy 4-এর টাচ্স্ক্রিনের মতো ফুটে উঠবে'। বলেই দেবতারা সব উধাও, দেখি আমি বিছানায় বসে চোখ কচলাচ্ছি। পাপী মন তো, তাই সন্দেহ হচ্ছে সত্যিই পেলাম দিব্যদৃষ্টি, নাকি সবই মায়া। যাচিয়ে নিতে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলাম। ঐতো, সামনের ফুটপাথে সেই ছেঁড়াজামা পরা কালিঝুলিমাখা বুড়োটা বসে রয়েছে, যে সারাদিন ওখানে বসেই বিড়বিড় করে। কই, আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠল না তো কিছু ! এটা কি তবে 'মেড্ ইন্ চায়না' ফক্কিকারি দিব্যদৃষ্টি যে পেতে-না-পেতেই অকেজো ? খানিক ভাবতে খেয়াল হল, বুড়োটা তো পাগল, ওর মনে যা অসংলগ্ন চিন্তাটিন্তা আসে সব মুখেই বলে দেয়। 'মনে এক, মুখে আর এক' টাইপ নয়। তাই বোধহয় দিব্যদৃষ্টি অ্যাক্টিভেটেড হয়নি। দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ শুনলাম যেন ? খুলে দেখি রান্নার মেয়েটা এসেছে, অন্যদিনের থেকে বেশ খানিকটা দেরীতে। আসতে দেরী হলেই ও যে বাঁধাধরা অজুহাতগুলো দেয়, সেসব আজ দিলনা। বলল, 'মায়ের শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে দাদা, সকালে উঠে দেখি গায়ে জ্বর। পাড়ার হোমিওপাতি ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ওষুধ-টষুধ খাইয়ে এলাম বলে এত দেরী।' ওর চিন্তাগ্রস্ত, গম্ভীর মুখ দেখে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে যাব, এমন সময় – একী – মনের ভেতর স্পষ্ট বড়বড় হরফে এটা কী দেখতে

পাচ্ছি ? 'নাইট শো-তে সানি লিওন আর রণবীর কাপুরের ফাটাফাটি সিনেমাটা দেখে একটু মস্তিটস্তি করে ঘরে ফিরতে রাত হয়ে গেল বলেই যে আজ সকালে উঠতে দেরী, সেকথা কি আর তোমায় বলা যায় চাঁদু ?'

সেই শুরু । তারপর থেকে যেখানেই যাই যারই মুখোমুখি হই, তার সঙ্গে আমার দু-ধরণের সমান্তরাল কথোপকথন চলতে থাকে । একটা মৌখিক এবং প্রকাশ্য, অন্যটা তার মনের গোপন কথা যা সে জানেও না আমি বুঝে ফেলছি । (এই দ্বিতীয়টা এখন থেকে ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে) । যেমন সেদিন সকালে বাজারে যেতে যেতে দেখা হল পাড়ার বেচু বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে । রিটায়ার্ড মানুষ, সারাজীবন জমিবাড়ীর দালালি করে দুহাতে কামিয়েছেন । যেমন মানিব্যাগের জোর, তেমনি দরাজ মন । পাড়ার পুজোআচ্চায় উৎসবে-অনুষ্ঠানে মোটা চাঁদা দেন বলে ছেলেছোকরা আর রক্‌বাজ মস্তানদের খুব প্রিয় । দেখা হতেই হ্যা-হ্যা করে দেঁতো হাসি,

— কী হে পেঁপেচোর, তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায়না । দুবেলা খুব করে প্রাইভেট টুইশন্ পড়াচ্ছো বুঝি ? (আর না পড়িয়ে উপায় কী ? তোদের পেঁপেচোরের চাকরিতে ক-টাকাই বা মাইনে দেয় ?)

অন্য পেশার লোকজনদের প্রতি, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি, বেচুদার শ্রদ্ধাভক্তি চিরকালই লেজেন্ডারী । ইচ্ছে করে টিচারকে 'চিটার', প্রোফেসরকে 'পেঁপেচোর' আর ইঞ্জিনিয়ারকে 'মিস্তিরি' বলে এসেছেন সারাজীবন । এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দায়সারাভাবে উত্তর দিলাম,

— 'আর বলেন কেন দাদা ? যা গরম পড়েছে এবার, রাস্তাঘাটে বেরোনোই দায় । তা আপনার খবর কী ?'

— 'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, যা বলেছ ভায়া । এই গরমে এসি গাড়ীতে বসেও লোকে দদ্দর করে ঘামে । তার ওপর আমার মারুতি-সুজুকিটার এসিতে আবার কদিন ধরে গন্ডগোল । সারাতে দেব, কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ তো চাই । তাই বাধ্য হয়ে একটা টাটা ইন্ডিকা কিনতে হল । তোমার বৌদি শপিং মল্-টলে যাওয়ার সময় যাতে অন্ততঃ —'(কী, কেমন বুঝছিস ? রোজ তো ঠা-ঠা রোদে চোখে হাতের আড়াল দিয়ে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকিস । বাপের জন্মে ক্ষমতা হবে দু-দুটো গাড়ী পোষার ?)

মাথা ঠান্ডা রেখে বললাম,

— 'ভাল করেছেন দাদা । আর আপনার ছেলেমেয়েরা? তাদের জন্যও আলাদা এসি গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে তো ?'

— 'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, ঠাট্টা করছ ভায়া ? বাবলু তো গেল মাসে প্রোমোশন পেয়ে এখন ডেপুটি ডিরেক্টর । ওর তো আপিসের গাড়ীতেই সবকিছু । আর বুবলির কথা না বলাই ভাল । তিনি এখন এন্ জি ও করছেন, বস্তির বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন । গাড়ী তো দূরের কথা, ট্যাক্সিও চড়েন না । চড়লে জাত যাবে বোধহয় ।' (হুঁঃ, আবার ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ! নিজে তো বিয়েটুকুও করিস্‌নি । বৌকে খাওয়াবার মুরোদ নেই, নাকি কেষ্টঠাকুরের মতো গোপিনীদের সঙ্গে লীলাখেলা চালিয়ে যাচ্ছিস ?)

এরপর আর কথা চলেনা । আজ একটু সকাল সকাল কলেজ যেতে হবে, তাড়া আছে — এই বলে হন্‌হন্ করে হাঁটা লাগালাম বাজারের দিকে ।

বাজারে চেনা মাছঅলা । সে আমাকে দেখেই প্রতিদিনের মতো একটা বড়সড় রুই বঁটিতে ফেলে খচাৎ করে দু-আধখানা করে বলল,

— 'আজ এক্কেবারে ফেরেস্ আচে দাদাবাবু, সক্কালবেলা ক্যানিং-এর গাড়ীতে এয়েচে । আপনার জন্যিই রেখে দিয়েচি, ইস্‌পেশাল । ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে দি ?' (বাপধন, এই মালটা সেই কাল দুপুর থেকি বরফে রাখা আচে, তোমায় না গছাতে পারলে পচে নষ্ট হবে ।)

অন্যদিন হলে আর বাক্যব্যয় না করে নিয়েই নিতাম, কিন্তু আজ গম্ভীর মুখে বললাম,

— 'কানাইদা, বাজারে এত মাছঅলা, তবু আমি রোজ তোমার কাছেই আসি । আর তুমি সেই আমাকেই ঠকাচ্ছ ? দেখাও দেখি কান্‌কো উল্টে, কেমন ফেরেস্ ।'

— 'এহেহে, এট্টু আগে বলতে হতো গো দাদাবাবু । দ্যাখলেন না, কান্‌কো ফুলকো নাড়িভুড়ি সব ফেইলে দিলুম নদ্দমায় ? আর আপনারে ঠকাবো ? রামো রামো রামো । সেই আপনার বাবার আমল থিকে মাছ দিয়ে আসতিচি আপনাদের, কোনোদিন খারাপ পেইয়েচেন ? নিন, পেটি বাদ দিয়ে গাদা থেকে দিচ্চি —' (আই বাপ ! খোকা দিকি বড় হয়ে গেচে ! বলে কান্‌কো উল্টে দেখাও ! মনে সন্দো যকন ঢুকেচে, দশ-বিশ ট্যাকা না কমালে নেবেনা ।)

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'না না, ওটা থাক, আজ এই ট্যাংরাগুলোই দাও । জ্যান্ত আছে দেখছি ।' অগত্যা ব্যাজার

মুখে দাঁড়িপাল্লায় ট্যাংরা তুলতে তুলতে সে সদ্য-এসে-দাঁড়ানো আরেকজন খদ্দেরের কাছে সেই দু-আধখানা বাসি রুইয়ের গুণগান করতে থাকে।

খেয়েদেয়ে ব্যাগপত্তর নিয়ে কলেজে যাওয়ার জন্য বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছি, দেখি মনোতোষ অনেক আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! রোজ তো দেখি শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এসে বাসে ওঠে। সল্টলেকের নামকরা টেলিকম্ কোম্পানীর জুনিয়র ম্যানেজার। উল্টোডাঙার মোড়ে নেবে শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে। চালচলনে, পোশাকে-আশাকে রীতিমতো শৌখীন। চেহারাও বেশ হ্যান্ডসাম। মুশকিল হচ্ছে, সবসময় কেমন একটা 'রোমিও রোমিও' ভাব। বিয়ে করেনি এখনো, কিন্তু শুনেছি গার্লফ্রেন্ডের সংখ্যা ঈর্ষণীয়। বন্ধুমহলে মোস্ট এলিজিব্‌ল্ ব্যাচেলারের দেমাক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, কিন্তু দেখেও দেখল না। গল্পে মশগুল। কার সঙ্গে এত গল্প! ভাল করে তাকিয়ে দেখি তৃপ্তিবৌদি। বয়সে বছরখানেকের বড় হলেও আমি 'বৌদি' বলেই ডাকি। কারণ দ্বিজপদ-দা, মানে ওর স্বামী, আমার চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের সিনিয়র। দুজনে একেবারে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ। দ্বিজপদ-দা যেমন অন্তর্মুখী, চুপচাপ আর বুড়োটেমার্কা, তৃপ্তিবৌদি তেমনি মিশুকে, বাচাল আর অতি-অধুনিকা। অতএব যা হয় তাই – অসুখী দাম্পত্যজীবন। স্বামীর খিটখিটে মেজাজ আর সন্দেহবাতিক শুধু নয়, তাঁর সেকেলে নামটাও ওর দুচক্ষের বিষ। তাই বৌয়ের মুখে দ্বিজপদ চ্যাটার্জীর আধুনিকীকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ডিপ্‌চ্যাট'। আজ বাসের লাইনে ওরা আমাকে এড়িয়ে গেলেও শব্দতরঙ্গকে তো আটকানো যায়না। ওদের টুকরোটাকরা কথোপকথন কানে এল। শুনলাম মনোতোষ বলছে

– 'ওঃ, এই গরমে এত সেজেগুজে থাক কী করে বল তো? আমার তো ইচ্ছে করছে স্যান্ডোগেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে অফিস যাই।' (তুমি যে সেদিন সাউথ সিটি মলে গেঞ্জিমার্কা স্লীভ্‌লেস টপ্‌টা পরেছিলে, যা ফাটাফাটি লাগছিল না – কী বলব!)

– 'হ্যাঁ, ওটাই বাকি আছে। এবার আমরা মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরে অফিস যাব।' (পরতে তো ইচ্ছে করেই, সারা পৃথিবীর মেয়েরা পরছে আর আমরা পরব না কেন? কিন্তু এই কন্‌জারভেটিভ, ব্যাকওয়ার্ড সোসাইটিতে তার উপায় আছে?)

– 'নাঃ, তোমার মুখে দেখছি কিছুই আটকায় না। আমি তা বলিনি। যাক্‌গে, এই উইকএন্ডে আবার কোথাও পার্টি-ফার্টি আছে নাকি? তোমার তো লেগেই থাকে রাতদিন।' (কিছুতেই একটু ফাঁকা পাওয়া যায়না তোমায় মাইরি! যখনই বাড়ীতে যাই, হয় তোমার বুড্‌ঢা শকুন হাজ্‌ব্যান্ডটা যখের মতো আগলে বসে আছে, নয়তো তুমি পার্টিতে বেরোচ্ছ।)

– 'না গো, শুক্কুরবার তো ডিপ্‌চ্যাট অফিস ট্রিপে বেরোবে শিলিগুড়ি। তিন দিনের জন্য। তাই ভাবছি ঐ কটা দিন বাড়ীতেই রেস্ট নেব।' (নাও, যা যা সিগ্‌ন্যাল চাইছিলে সবই দিলাম। দেখি এবার তোমার অ্যান্টেনা কেমন খাড়া।)

– 'রিয়েলি? তুমি আর বিশ্রাম? সূর্য কোন্‌দিকে উঠল আজ? আমার আবার এই উইকএন্ডে একটু ঝামেলা আছে। নাহলে হয়তো স্টপ্-বাই করে একবার হ্যালো বলে আসতাম।' (একটু পাঁয়তারা না কষলে তুমি যে হ্যাংলা ভাববে সুন্দরী। সত্যিই ভাবলে নাকি আমার সময় নেই? ধ্যাৎ, আমি তো আজ থেকেই শুক্কুরবারের জন্য হাপিত্যেশ করে থাকব!)

– 'ও, আচ্ছা। নাঃ, তার দরকার হবেনা। মাঝে মাঝে একলা বিশ্রাম নিতেও ইচ্ছে করে। যা হেক্টিক লাইফ। থ্যাংক্‌স্ এনিওয়ে।' (হুঁহুঁ বাবা, বঁড়শিতে তো গেঁথে গেছ, এবার ছিপে খেলাতে আমিও জানি। সী ইউ ফ্রাইডে ইভ্‌নিং, খোকাবাবু!)

এই মুখরোচক কথাবার্তা হয়তো চলত আরো খানিকক্ষণ, কিন্তু বাস্‌টা এই সময় বেরসিকের মতো ইঞ্জিনের গর্জন তুলে এসে দাঁড়ানোয় গল্পে ইতি পড়ল। আচ্ছা, আমাদের 'রোমিও' তাহলে তার নতুন 'জুলিয়েট' পেয়ে গেছে! এই তো সেদিন কানাঘুষো শুনলাম টানা একবছর মাখামাখির পর একজনের সঙ্গে নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এ যে দেখি পাকা অ্যাক্রোব্যাট – ট্রাপিজের মতো একটা ছাড়ছে আরেকটা ধরছে। বাসের দমবন্ধ ভীড়েও সেদিন অনেকবার জুলিয়েট-বৌদির, থুড়ি, তৃপ্তিবৌদির দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল দ্বিজপদ-দার কথা। ভাবছিলাম ওঁর কেস্‌টাকে আজকালকার চ্যাংড়া ছেলেমেয়েরা কোন্ ক্যাটেগোরিতে ফেলবে – BTV না BBC? অর্থাৎ 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' না 'বুড়োর বউ চুরি'? নাকি দুটোই?

যাইহোক, কলেজে পৌঁছে দেখি আরেক কান্ড। ঢোকার রাস্তা বন্ধ। সাপোর্ট স্টাফ কোঅর্ডিনেশন কমিটি গেটের সামনে পিকেটিং করছে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে। আমি পিকেট লাইন এড়িয়ে জটলার মধ্যে ফাঁক খুঁজে গেটের দিকে এগোতেই পথ আটকাল কয়েকজন,

– 'স্যার, আজ আমরা কাউকে ভেতরে যেতে দিচ্ছি না।' (দেখতেই তো পাচ্ছ চাঁদু অবরোধ চলছে। সেসবের তোয়াক্কা না করে কি হিরোবাজি করা হচ্ছে?)

আমি শান্তস্বরে বললাম,

– 'দেখুন, আপনাদের আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ভাইস্ প্রিন্সিপালের সঙ্গে জরুরী মিটিং আছে। প্লিজ্ যেতে দিন।'

– 'স্যার, তাহলে কি ধরে নেব আপনি আমাদের চোদ্দো দফা দাবী সমর্থন করেন না?' (করিস না তো জানিই। আজ অবধি জীবনে কোনোদিন কোঅর্ডিনেশন কমিটিকে এক পয়সা চাঁদা দিয়েছিস? চাইতে গেলে আবার ন্যাকামি করে বলিস, 'অ্যামি র‍্যাজনীতি ক্যারি ন্যা'। ব্যাটাচ্ছেলে, সতীপনা ঘুচিয়ে দেব তোর।)

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে বললাম,

– 'সমর্থন করতে গেলে আগে তো ভাল করে জানতে হবে দাবীগুলো কী, ভেবে দেখতে হবে তাদের যৌক্তিকতা। এর কোনোটাই এখন এখানে দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়। আমার মিটিঙে দেরী হয়ে যাচ্ছে, পরে কথা বলব এ নিয়ে।'

বলে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকতে যেতেই পিকেটিং ছেড়ে তেড়ে এল কয়েকজন, ঘিরে ধরল আমায়। ঠিক সেই সময় কানে এল একটা ভারিক্কি ধরণের মস্তানমার্কা কণ্ঠস্বর,

– 'আবে অ্যাই, যেতে দে, যেতে দে। হুজ্জুতি করিস না। পরে দেখছি।' (নাঃ, এই ছোকরা মাস্টারটার সঙ্গে এবার একটা হেস্তনেস্ত দরকার। অনেকদিন ধরেই পার্টির ব্ল্যাক্‌লিস্টে আছে, বহুত বাড় বেড়েছে। দেখব আজ কী করে বাড়ী যায় শুয়োরের --')

এ হল পার্টির ডাকসাইটে যুবনেতা বাপী বসাক। চিনি, কারণ আগেও দু-একবার মোলাকাত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলছে, আজ বাড়ী ফেরা সত্যিই মুশকিল হতে পারে।

চিন্তিতমনে কলেজে ঢুকে দোতলার সিঁড়ির কাছটায় আসতেই দেখি ওপর থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে আসছে স্বাতী। পলিটিকাল সায়েন্সের লেক্‌চারার। বছর দুই আগে ঢুকেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আমি তো ভাবলাম এবার একটা ঝামেলা বাধবে গেটের সামনে।' (আর যাই হোক, গুন্ডা-মস্তানদের সঙ্গে মারামারি করার ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা নেই।)

যেন কিছুই হয়নি এমন তাচ্ছিল্যভরা গলায় বললাম, 'তুমি দোতলা থেকে সব দেখছিলে বুঝি? আরে না না, আমার সঙ্গে কিছু করার সাহস ওদের হতনা। এই সেদিন ওদের ওই পালের গোদাটা কলেজ ক্যাম্পাসে জঙ্গীপনা আর বোমাবাজির জন্য দলনেত্রীর কাছে ধ্যাতানি খেয়েছে। তা, তুমি ঢুকলে কী করে?'

– 'খুব বেঁচে গেছি। ওদের পিকেটিং শুরু হয়েছে পৌনে দশটায় আর আমাকে মল্লিকাদির গাড়ী নাবিয়ে দিয়ে গেছে সাড়ে নটা নাগাদ। উনি এদিকেই আসছিলেন, তাই লিফ্‌ট্ দিলেন।' (আহা, কী আমার সুপারম্যান্ রে! মুখেই যত বাহাদুরি। ভেতরে কেমন, সে আমার আর জানতে বাকী আছে?)

আর কথা না বাড়িয়ে ভাইস্ প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকি। কারণ স্বাতী দুটোই একদম ঠিক বলেছে, থুড়ি, ঠিক ভেবেছে। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির, মারপিট ঝুটঝামেলা এড়িয়ে চলতে ভালবাসি। আর সেটা ওর চেয়ে বেশী কেউ জানেনা, কারণ আমার মনের চাবিকাঠি ওরই হাতে। হ্যাঁ, ও আমায় ভালবাসে। আমি গোপিনীদের সঙ্গে লীলাখেলা বা ট্রাপিজ খেলা – কোনোটাই করে বেড়াই না। আমার ঐ একজনই। যাদবপুরে পোস্টগ্র্যাজুয়েট করতে গিয়ে আলাপ, তারপরে গত বছর চারেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। নানা কারণে সম্পর্কটাকে অফিসিয়াল করে তোলা হয়নি এখনো, কিন্তু ইদানীং দেখছি ওর দিক থেকে প্রচ্ছন্ন তাগাদা আসছে। আজ যেমন হাঁটতে হাঁটতে বলল,

– 'অ্যাই, তুমি শান্তির নীড়ের লটারিতে এন্ট্রি করেছ তো? জলছায়া আবাসনেরটা তো লাস্ট ডেট ভুলে গিয়ে হাতছাড়া করলে।' (ভুলে গিয়ে না হাতি! পকেটে অ্যাড্‌ভান্স দেওয়ার মালকড়ি ছিলনা, তাই ভুলের অজুহাতে এড়িয়ে গেলে। কতদিন ধরে বলছি, এসো দুজনে মিলে করি। তাতে আবার বাবুর প্রেস্টিজে লাগে।)

শান্তির নীড় আর জলছায়া আবাসন হল রাজারহাট নিউটাউনের দিকে সদ্য গজিয়ে ওঠা বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট

কম্প্লেক্স, যার তৈরীর কাজ শেষ না হতেই লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে । উঃ! মেয়েদের ইন্ট্যুইশন্ আর ষষ্ঠেন্দ্রিয়র কী জোর রে বাবা ! সব বুঝে ফেলে ! কই, ওদের তো এ-জিনিস তপস্যা করে পেতে হয়না ! নিয়েই জন্মায় । দেবতাদের কী অবিচার ! ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, 'নাঃ, এবার আর ভুলিনি । বাইপাসের ধারে প্রাচী সিটি আবাসনের লিস্টেও কপাল ঠুকে নাম দিয়ে দিয়েছি ।' অধৈর্য্য মেশানো গলায় প্রশ্ন এল ওর,

– 'পেলে কিনা জানা যাবে কবে ?' (ওঃ, আর পারছিনা । কতদিন এরকম সখা-সখী হয়ে ঘোরা যায় বল তো ? আমি এই বছরের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই ।)

এই বছর ! ওরেবাবা, সে তো বিরাট ব্যাপার ! আমি কিছু বলার আগেই ভাইস্ প্রিন্সিপালের ঘর এসে গেল । কিন্তু মিটিঙের মধ্যেও সারাক্ষণ ঐ কথাটাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল – এই বছর, এই বছর ।

এমনি করেই দিন কাটছিল, বুঝলেন ? চারপাশের চেনাঅচেনা মানুষদের বাইরের ভদ্রতা, শালীনতা আর ভালমানুষির মুখোশটা ভেদ করে তাদের ভেতরের আসল চেহারাটা জেনে ফেলায় কেমন একটা গোয়েন্দা গল্পের মতো উত্তেজনা-মেশানো আনন্দ আছে । অনেকটা যেন ইনফ্রারেড নাইট ভিশন গগ্‌ল্‌স্ পরে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবার অনুভূতি । এমন সব জিনিস চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেগুলো সাধারণ অবস্থায় কল্পনাও করতে পারতাম না । আবার উল্টোটাও হচ্ছে কখনো সখনো । যার বাইরের আপাতকঠিন, রুক্ষ, শীতল আবরণটা দেখে সকলের মতো আমিও ভুল বুঝতাম, তার অন্তরটাকে নতুন করে চিনতে পেরে পুলকিত হচ্ছি । টিভিতে অনেকদিন আগে 'যদি এমন হতো' বলে একটা বাংলা সিরিয়াল দেখেছিলাম । বাস্তবে যা ঘটে বা ঘটেছে, তার বিপরীত খাতে কাহিনী গড়ালে কেমন হতো সেই কাল্পনিক উপাখ্যান নিয়েই সিরিয়ালটা । আমার দিব্যদৃষ্টির দৌলতে চব্বিশ ঘন্টা আমার চারিদিকে সেই 'যদি এমন হতো'র এপিসোডের পর এপিসোড । কিন্তু ঐ যে – সব ভাল জিনিসই একদিন শেষ হয় । আমার বিনিপয়সায় সিরিয়াল দেখাও বেশীদিন টিকলো না, জানেন ? কেন, সেটাই বলি ।

একদিন এক অলস সকালে কলেজ ছুটি থাকায় দেরীতে ঘুম থেকে উঠে একতলায় লেটারবক্সে কোনো চিঠি এল কিনা দেখতে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখি দোতলায় সুধাময়বাবুর ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে এক নতুন মুখ । বছর তিরিশের একটা ছেলে । এমনিতে ওঁর ফ্ল্যাটে লোক আসাযাওয়া খুব কম । বয়স্ক বিপত্নীক মানুষ, একাই থাকেন । চিঠি নিয়ে ওপরে ওঠার পথে ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতে জিজ্ঞেস করে জানলাম, অনেক দিন ধরেই বাজার-দোকান করে দেবার জন্য একটা লোক খুঁজছিলেন । আজ পাড়ার ওষুধের দোকানের ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টটা তার চেনাশোনা এই ছেলেটাকে পাঠিয়েছে । দু-হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস, তাই একটা লোক না হলে চলছে না । কাল থেকেই বহাল করছেন ওকে । যাইহোক, দুপুরে খেয়েদেয়ে সেদিন আমার একটু কলেজস্ট্রীট বইপাড়ায় যাবার ছিল । ভাবলাম যাচ্ছিই যখন ওদিকে, শিয়ালদায় মাস্টারমশাইয়ের বাড়ীতে একবার টুঁ মেরে আসি । মাস্টারমশাই মানে সেই গ্র্যাজুয়েশনের সময় পড়েছি ওর কাছে । এখনও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন । বুড়ো হয়েছেন, শরীর অথর্ব । মাঝে মাঝে গল্প করতে গেলে খুশী হন । তাছাড়া আর্থিক সচ্ছলতাও নেই, একটা বহু পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ীতে কোনোরকমে থাকেন । সেটা জানি বলেই সেধে সেধে গিয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করি, আর উনিও কাছের লোক মনে করেন বলে নিতে আপত্তি করেন না । তো সেদিন সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকতেই মান্ধাতার আমলের চাকর দীনবন্ধুদা এসে বলল, এখন বাবুর কাছে দুজন বাইরের লোক রয়েছে, ওপরের ঘরে কথা বলছে । আমি যেন নীচের বৈঠকখানায় আপেক্ষা করি । সেই বিবর্ণ বৈঠকখানায় একা বসে বসে ঘুণধরা দেয়াল-আলমারীতে ইঁদুরে কাটা বইয়ের নামগুলো পড়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় খেয়াল হল কোথাকার কোন্ ফাটল দিয়ে ওপরের ঘরের কথাবার্তা সব শোনা যাচ্ছে । শুনলাম মাস্টারমশাই কাকে যেন বলছেন,

– 'পোস্ট অফিসের এম্ আই এস্ তো সেভেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেয়, তোমার এই নবভারতী সেভিংস্ স্কিম সত্যিই টোয়েন্টি দেবে ? গ্যারান্টি দিচ্ছ ?' (পোস্ট অফিসের সামান্য ওই কটা টাকা মাসের দশ তারিখেই ফুড়ুৎ । তারপর যে কীভাবে চালাই, শুধু আমিই জানি ।)

– 'না কাকাবাবু, আপনাকে তো বললাম, ওটা বছর বছর বেড়ে টোয়েন্টি হবে । শুরুতে টেন, একবছর পর টুয়েল্‌ভ, তারপর ফিফ্‌টিন – এরকম করে বাড়বে ।' (হেঃ হেঃ, এইতো বুড়ো টোপ গিলেছে ! এবার একটু সুতো ছাড়ি ।)

– 'ও তো তোমার মুখের কথা । লিখিত গ্যারান্টি না পেলে, কাগজপত্র পড়ে স্যাঙ্গুইন না হলে আমি এক পয়সাও দেবনা । আমার এম্ আই এস্ই ভাল ।' (হে ভগবান, ছোঁড়াটার মুখের কথা যেন সত্যি হয় । মাসকাবারে হাতে দুটো বেশী টাকা এলে মনে একটু জোর পাই ।)

– 'বিশ্বাস হচ্ছে না তো কাকাবাবু ? এই হল মুশকিল । চারপাশে এত জালিয়াতি আর দুনম্বরি যে আস্লি লোকের সাচ্চা কথাও ভাঁওতাবাজি মনে হয় । যাকগে, শুধু কথা শোনাতে তো আসিনি, প্যামফ্লেট, ব্রোশিওর সব নিয়েই এসেছি ।' (হুঁহুঁ বাবা, চুনোপুঁটি, রুইকাতলা, বোয়াল – সবার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা জাল থাকে ।)

– 'এগুলো আবার কী দিচ্ছ ?' (দূর ছাই, এখন এতসব কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভাল লাগছে না । চোখে দেখতেও পাইনা ভাল –)

– 'এটা হল ভারতের কোথায় কোথায় আমাদের ব্রাঞ্চ আছে তার লিস্ট, আর ঐটায় দেশের কোন্ কোন্ ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ তার ডিটেল্স্ । তাছাড়াও থাইল্যান্ডের এশিয়া-প্যাসিফিক ব্যাংক আমাদের – (কী বুড়ো, আরো বড় বড় নাম শুনতে চাও ? এইচ্ ডি এফ্ সি, এইচ্ এস্ বি সি – যা যা গ্যাস খাওয়াতে হয় সব খাওয়াব ।)

– 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, থাক । তুমি প্রশান্তর মাসতুতো ভাই, ও নিজে নিয়ে এসেছে তোমায়, সেই ভরসাতেই দেব । শুধু দুটো দিন ভাবতে দাও ।' (আমার আর অন্য পথ নেই । এটাই মনে হচ্ছে নিতে হবে । এম্ আই এস্ ম্যাচিওর করে যাচ্ছে এই মাসে, আর পোস্ট অফিসে আজকাল বড় ঝামেলা ।)

– 'কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না কাকাবাবু । ভাবুন । আমি পরশু আসব । (মার দিয়া কেল্লা ! এবার মাছরাঙা পরশুদিন এসে মাছটি নিয়ে ভোকাট্টা হবে ।)

আমি শুনছি আর আমার কান-মাথা গরম হয়ে উঠছে । এইসময় অন্য একটা গলা বলে উঠল,

– 'আর কাকা, এই বাড়ীটাও তো আপনি আমার চেনা প্রোমোটারের হাতেই দিচ্ছেন । সেখানেও নিশ্চিন্তি । খোকন দস্তিদার এক কথার মানুষ । বলেছে যখন বাড়ীর দলিল ট্রান্সফার হয়ে গেলেই আপনাকে থোক টাকা পেমেন্ট করে দেবে, দেবেই । তখন আপনি সেই টাকার একটা মোটা অংশ এই নবভারতী স্কিমে ঢালতে পারবেন –' (ভাগ্যিস খোকন দস্তিদারের কীর্তিকলাপ জানেনা বুড়োটা ! জানলে আর ভুজুংভাজুং দিয়ে রাজী করাতে পারতাম না ।)

খোকন দস্তিদার !! সর্বনাশ !! মাস্টারমশাই না জানলে কী হবে, আমি তো জানি । চোরাকারবার, তহবিল তছরুপ আর বেআইনি অস্ত্র পাচারের অভিযোগে তিন-তিনবার গ্রেফ্তার করেও পুলিশ ওর কিচ্ছু করতে পারেনি শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন পার্টির ঘনিষ্ঠ বলে । এখন দিব্যি সাধু সেজে প্রোমোটিং-এর ব্যবসা করে বেড়াচ্ছে । ওর পাল্লায় পড়ে লোকের কী হাল হয়েছে, সেটা জেনে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি ? হুড়মুড় করে লোহার সিঁড়িটা দিয়ে দোতলায় উঠে মাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম,

– 'কী করছেন কী আপনি ? না জেনে না বুঝে এভাবে –'

– 'আরে, তুমি কখন এলে ? দীনবন্ধু বলেনি তো । চা-টা দিয়েছে ? আমার এদের সঙ্গে একটু দরকারী কাজ ছিল । আলাপ করিয়ে দি । এ প্রশান্ত – আমার এক দূরসম্পর্কের ভাইপোর ছোটশালা । আর ও হল ওর মাসতুতো ভাই ।' (দূর বাবা, বেছে বেছে আজকেই হাজির হলে ? জানিয়ে আসবে তো ! তাহলে বলতাম কাল এসো ।)

– 'কিন্তু মাস্টারমশাই, একটা জরুরী কথা আপনাকে –' বলতে গিয়ে থমকে গেলাম । ঠিক কী বলব ? এই লোকদুটোর সামনেই বলব এরা জোচ্চুরির মতলবে এসেছে ? যদি মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন কী করে জানলাম, কীভাবে ব্যাখ্যা করব ব্যাপারটা ? বলব দিব্যদৃষ্টির জোরে ? শুনে ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলোও বোধহয় হাসবে । আমায় আমতা আমতা করতে দেখে মাস্টারমশাই বললেন,

– 'বেশ তো, তুমি নীচে অপেক্ষা করো । আমি একটু পরে আসছি । চলো বাবা প্রশান্ত, তোমায় বাড়ীর দলিলটা এরবার দেখিয়ে নিই ।' (হঠাৎ করে সন্ধ্যেবেলা উদয় হলে, বুঝতে পারছনা তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করার আজ আমার সময় নেই ? যত্তসব –)

নিজের ওপর অসহায় আক্রোশ চেপে আমি নীচে নেমে সোজা বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম । সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমেছে, আমার বাড়ীর দিকে যাওয়ার বাস পাওয়া এখন মুশকিল । ভাবলাম দূর ছাই, একটা ট্যাক্সিই ধরি । বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি আমার হাত দেখানোর তোয়াক্কা না করে সাঁ-সাঁ বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা এসে থামল । সামনের

সীটে ড্রাইভার আর তার হেল্পার বসে আছে । দুজনেই পেটা চেহারার যুবক । গন্তব্য বলতেই দরজা খুলে দিল, উঠলাম । খানিক যাওয়ার পর দেখি উড়ালপুলের ঠিক নীচের বাস্‌স্ট্যান্ডটায় এক যুবতী 'অ্যাই ট্যাক্সি, অ্যাই ট্যাক্সি' করতে করতে আমাদের গাড়ীটার দিকে এগিয়ে আসছে । দেখতে পায়নি বোধহয় আমি ভেতরে আছি । গাড়ী থামতে যুবতী এগিয়ে এসে বলল, 'বাঁশদ্রোণী যাবেন ?' তারপরেই আমার দিকে নজর পড়ায় অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও, লোক আছে । একজনের জায়গা হবে দাদা ? শেয়ারে যাব ।' (পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি, একটা বাস নেই । আর পারছি না) । ড্রাইভার ওর কথায় কেনোরকম পাত্তা না দিয়ে সোজা গাড়ী চালিয়ে দিল । কিন্তু মিনিটখানেক এগিয়েই থামল খ্যাঁচ্ করে । হেল্পার জানতে চাইল,

– 'কিরে, থামলি কেন?' (মালের নেশা এখনো কাটেনি না কি?)

গাড়ী রিভার্সে দিয়ে পিছোতে পিছোতে ড্রাইভারের উত্তর,

– 'বাঁশদ্রোণী বলছিল না ? চল্ নিয়েই নি ।' (মেয়েটার কী টস্‌টসে ফিগার দেখলি না ? আবার লো-কাট্ সালোয়ার-কামিজ পরেছে । একেবারে যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে মাইরি !)

– 'আরে বাঁশদ্রোণী যেতে বহুত ঘুরতে হবে । সন্তোষপুরের ওখানটা রাস্তা-ফাস্তা খোঁড়া আছে ।' (ব্যস্, যেই মেয়ে দেখলি অমনি গলে গেলি ?)

– 'আরে চালাব তো আমি, তোর অত কী ? বোস্ তো চুপচাপ ।' (বাঁশদ্রোণী অবধি যাচ্ছে কে, ইয়ার ? পথে কসবা-তিলজলায় প্রচুর বাঁশঝাড় আছে । ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেললেই তো কম্মো হয়ে যাবে ।)

টস্‌টসে, বাঁশঝাড়, কম্মো ? আমার মাথায় ঝট করে ইকুয়েশনটা পরিষ্কার হয়ে যায় । গাড়ী পিছিয়ে বাস্‌স্ট্যান্ডে এনে সেই মেয়েটিকে ওরা হাত নেড়ে ডাকতেই দৃঢ় গলায় বলি, 'না, আমি শেয়ারে যাব না ।'

– 'কেন, আপনাকে আপনার জায়গায় ঠিকঠাক নাবিয়ে দিলেই তো হল । আপনিই তো আগে নাববেন ।' (তোমায় সাক্ষী রেখে ওসব করব নাকি চাঁদু ?)

– 'সে যাই হোক, ওঠার সময় তো শেয়ারে যাব বলে উঠিনি, এখন মাঝপথে এসব বলছ কেন ?'

– 'দাদা, তাহলে নেবে যান তো । অন্য ট্যাক্সি দেখুন । এই দিদি তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে । আমরা একটা মানুষের উপকার করতে চাইছি, আর আপনি –' (ব্যাটা বেশী ওস্তাদি মারবি তো বাইপাসের ধারে নিয়ে গিয়ে লাশ ফেলে দেব, রাত্তিরে কেউ দেখতেও পাবেনা ।)

– 'তোমরা এরকম করলে কিন্তু আমি পুলিশে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব ।' বলে আমি মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে পুলিশ খুঁজতে থাকি । হায়, ত্রিসীমানার মধ্যে পুলিশের 'প' ও নেই । তাছাড়া থাকলেই বা কী ? তাদের যদি বলতাম আমি আমার দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এরা এই মেয়েটার সর্বনাশ করতে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো কমিক হিন্দী সিনেমার মতো আমাকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেত । আর যাকে বাঁচাতে চাইছি তাকে বলেও লাভ নেই, কারণ তার কানেও ওটা আষাঢ়ে গল্পের মতোই শোনাবে । অতঃপর 'কী, কথা কানে যাচ্ছে না ? যান, নাবুন' বলে আমাকে একপ্রকার ঠেলে নাবিয়ে দিয়ে তাদের 'দিদিকে' নিয়ে চলে গেল তারা । হয়তো কালকের কোনো খবরের কাগজে ভেতরের পাতার এককোণে একচিলতে খবর হবে মেয়েটা ।

মানসিকভাবে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে মিনিবাস আর অটো ঠেঙিয়ে যখন বাড়ীর রাস্তায় এসে নাবলাম, ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁইছুঁই । দেখি গলির মোড়ের ওষুধের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে সেই ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টটা । তার পাশে লাঠি ঠুকঠুক করে বুড়োমতো ওটা কে ? ও, সুধাময়বাবু । রাতবিরেতে ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছিল বোধহয়, তাই নিতে এসেছেন । বাড়ীর দিকে হেঁটে যেতে যেতে শুনতে পেলাম ওদের কথাবার্তা । ছোকরা জিজ্ঞেস করল,

– 'লালটু তাহলে কাল থেকেই কাজে আসছে ? ওকে আজ বাজারদোকান সব দেখিয়ে দিয়েছেন তো ?' (আলমারীর চাবি-ফাবি, টাকাপয়সা সোনাদানা বাড়ীতে কোথায় থাকে – এগুলো ও নিজেই দেখে নেবে । দুটো দিন সবুর কর বুড়ো । হিঃ হিঃ ।)

মানে !! মতলবটা কী ছোকরার ? সুধাময়বাবুর উত্তর এল,

– 'হ্যাঁ, পুষ্পর মা সকাল বেলা ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসন মেজে চলে যাবার পর একটু বেলার দিকে ও এসে বাজার-টাজার করে দেবে বলেছে ।' (পুষ্পর মা কে দিয়েই তো এতদিন বাজারহাট করাতাম, কিন্তু ওর বাপু বড় হাতটান ।)

– 'লালটু খুব চটপটে ছেলে, দাদু। দেখবেন, আপনার আর কোনো অসুবিধে হবেনা।' (মানে ঘরে টাকাকড়ি, দামী জিনিস রাখার টেন্‌সন্‌ আর বেশীদিন নিতে হবেনা। ও সুড়ুৎ করে সব বাগিয়ে নিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাবে। তখন তুমি এক্কেবারে ঝাড়া-হাত-পা, বুঝলে বুড়ো ভাম ?)

আমি আর থাকতে পারলাম না। সোজা গিয়ে সুধাময়বাবুকে বললাম, 'ঐ নতুন ছেলেটাকে ছাড়িয়ে দিন মেসোমশাই। ওকে রাখতে হবেনা।' চমকে গেলেন সুধাময়বাবু,

– 'একী, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে ? আর ছাড়িয়ে দেব মানে ? এখনো তো শুরুই করেনি। কয়েকদিন রেখে দেখি কাজকর্ম কেমন। খারাপ হলে তখন নাহয় –' (এ আবার কী বেআক্কেলে কথা ? নেশাটেশা করে এসেছ নাকি বাপু ?)

আমি মরিয়া হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'মেসোমশাই, আপনি একা থাকেন। চেনা নেই শোনা নেই যাকে তাকে এভাবে বাড়ীতে ঢোকালে বিপদ হতে পারে। কাগজে পড়েন না ?'

বেগতিক দেখে এবার ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টটা প্রতিবাদ করে,

– 'কী বলতে চান কী ? চেনাশোনা নেই মানে ? লালটু আমার পাড়ার ছেলে, চাঁপাডালিতে ছোটবেলায় একই ইস্কুলে পড়েছি। দাদুকে আমি উল্টোপাল্টা লোক দেব ?' (হেব্‌বি ডেঞ্জারাস তো তুই ! আমার মনের কথা টের পেলি কী করে ?)

সুধাময়বাবু যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,

– 'বুড়োমানুষ একা থাকি, সেটা তোমরা ইয়ং ছেলেরা তো খেয়ালই রাখ না। ফ্ল্যাটবাড়ীর কে কবার এসে খোঁজ নেয় বল তো ? ওসব বিপদ-টিপদ বলে লাভ নেই বাবা, আমার ব্যবস্থা আমাকেই করে নিতে দাও।' (রোজ দেখ দুপায়ে বাত নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটি। তুমি, সমীর, উৎপল, সুব্রত – কেউ কখনো একবারটি বলেছ, দিন মেসোমশাই, বাজারটা করে দি ? হুঁঃ, আবার গায়ে পড়ে দরদ দেখানো হচ্ছে !)

বলে লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে যান উনি। আর সেই আধো-অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ একটা গভীর উপলব্ধি হয় আমার। দিব্যদৃষ্টি পাওয়াটা আসলে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। আজ সারাদিনে আমার চোখের সামনে তিন-তিনটে মানুষ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেছে। আমি সব দেখেছি, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারিনি। এ-আক্ষেপ এখন আমায় সারাজীবন কুরে কুরে খাবে। আমার সমস্ত শরীর-মন জুড়ে একটা তীব্র বিতৃষ্ণা এল, দৌড়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঢুকেই বিছানায় গিয়ে বসলাম তপস্যা করতে। হাতজোড় করে আকুতি জানালাম, হে দেবতাগণ, বর যদি দিতে চান, তাহলে শুধু দিব্যদৃষ্টি নয়, তার সঙ্গে দুটো দিব্যহাতও দিন। যাতে মিথ্যের গলায় সত্যির ফাঁস পরিয়ে তার টুঁটি টিপে ধরতে পারি, সত্যির লেজার রশ্মি হেনে ছাই করে দিতে পারি মিথ্যের নকল বুঁদিগড়। আর তা যদি না দেন, তাহলে ফিরিয়ে নিন এই শখের দিব্যদৃষ্টি। এ আমার জন্য নয়। পৃথিবীতে আমার মতো মানুষের মিথ্যের রঙীন জামা গায়ে মিথ্যের সুগন্ধী আতর মেখে মিথ্যের ললিপপ্‌ চুষতে চুষতে মিথ্যের ফানুসে ভেসে বেড়ানোই ভাল। সত্যির ভাইরাস থেকে দূরে থাকতে পারলে জীবন কত ঝামেলাহীন। কোনো অনুতাপ নেই, কোনো অপরাধবোধ নেই, কোনো বিবেকদংশন নেই। সত্যির ঝাঁঝে বড় জ্বালা। সত্যি বলছি।

হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছেগুলো

ধীমান চক্রবর্তী

ছড়িয়ে থাকে জল-মাটিতে, জড়িয়ে থাকে লেগে
কখন আগুন উস্কানি পায় – আতঙ্কে, উদ্বেগে
জ্বলে ওঠে শুক্‌নো পাতা, ধোঁয়ায় ভরে হাওয়া
হারিয়ে যায় ঘূর্ণিঝড়ে সকল চাওয়া-পাওয়া ।
হারিয়ে যায় একটা মানুষ ঘুমের থেকে জেগে
প'ড়ে থাকে ইচ্ছেগুলো জল-মাটিতে লেগে ।

একদিন সব সত্যি ছিল

ধীমান চক্রবর্তী

অনন্ত কাল হাত ধরিনি ।
সেই কবে সব সত্যি ছিল -
রূপকথা আর রাতমিছিলও
তোমায়-আমায় রাখত ঋণী,

স্বপ্ন আঁকত অসম্ভবের ।
বনের পথে জলচেতনা
হারিয়ে যেতে ভয় পেত না
আকাশ-জোড়া মহোৎসবে ।

সেই সমস্ত তারার জ্যোতি
কোথায় গেল ? নিস্তরঙ্গে
একলা ব'সে ছায়ার সঙ্গে
হয় তো ভাববে, ইচ্ছামতী,

সন্ধ্যা ফুলের গন্ধে বিলোল,
হাল্‌কা মেঘের আচ্ছাদনে
যখন আবার পড়বে মনে
একদিন সব সত্যি ছিল ।

জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা । বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী - প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও । পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক । কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঠালি কলা । নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা ।

কবি প্রসঙ্গ

সেতারা হাসান

আমি কবি হতে চাই না
কবিরা কেমন কথা দিয়ে কথার মালা সাজায়
মনের অতল থেকে বোধ তুলে আনে,
কথার আবর্তে ঢেকে
অনুভূতিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়

অঙ্কের বাইরে হিসেব কষে হিসাব মেলাতে চায় !
কবি আনন্দ খুঁজে ফেরে ধানের শীষে আর সবুজ ঘাসে
বেদনার অশ্রু মেশায় শিশির কণায়
কবিরা মানুষের মন নিয়ে বড় বেশী খেলা করে
তাই আমি কবি হতে চাই না ।

নিঝুম দুপুরে, বউ কথা কও পাখী ডাকে
ঝলকে পড়া রোদের আলো পাখীর পালকে
চিক চিক করে ওঠে
কবি মন উদাস হয়ে যায়,
ঢুকে পড়ে কবোষ্ণ পাখীর বুকে
উড়ে চলে সাথে দিগন্তের ওপারে ----
আগোছাল সংসার অযন্তে পড়ে থাকে
অবিন্যস্ত ঘর দোর, পরিধেয় বস্ত্র, যত্র তত্র ।
মশলার কৌটা গুলো মেঝেতে গড়ায়
উনুনে রান্না পুড়ে যায় ।
অভুক্ত স্বজনেরা গম্ভীর মুখে উঠে যায়,
অবারিত স্নেহের হাত সংকুচিত হয়ে আসে ।
কিন্তু আমি তো একটা ঝকঝকে সাজানো সংসার চাই
তৃপ্ত স্বজন চাই, বুক ভরা আশীর্বাদ চাই
তাই আমি কবি হতে চাই না ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসে,
মিশে যায় রাতের কুহেলিকায় ----
অশ্রুত সঙ্গীতের সুরে কবি মন
ওঠা নামা করে তাল, লয় ছন্দে ----
ভেসে যায় কোন অজানায় ।
কবি মনে মনে কবিতার পংক্তি আউড়ায় ।
তাচ্ছিল্যের অসহ্য অভিমানে পাশে থাকা দয়িতের মন
বিষণ্ন হয়ে যায়
ভালবাসার হাত শিথিল হয়ে আসে,
সোহাগের হাত ব্যর্থ হয়ে যায় !
কিন্তু আমি তো তৃপ্ত দয়িত চাই,
একটা সঘন পরিপূর্ণ সোহাগের রাত চাই
তাই আমি কবি হতে চাই না ।

দুই আর পাঁচ বছরের শিশু দুটি দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়
সারা বাড়ীময়, লুকোচুরি খেলে হেসে লুটোপুটি খায়
কবি তারি সাথে মেতে উঠে পাড়ি দেয় অন্য লোকে
স্বপ্নের দেশে, বিধিনিষেধহীন শিশু রাজ্যে
স্নানের সময় গড়িয়ে যায় ওদের,
খাওয়া হয় না সময় মতো
লেখাপড়া কোথায় যায় ভেসে,
পরীক্ষার দিন থাকে নাকো মনে,
খাতা কলম পাওয়া যায় না খুঁজে
পড়শিরা বলে, ছেলে গুলো মানুষ হবে কি করে ?
সময়কে বেঁধে দিতে হবে নিয়মের আওতায়
টিকে যেতে হবে প্রতিযোগিতায়
ধাপের সিঁড়ি গুলো হবে উতরাতে
সেটাই তো সুখের সোপান !
আমি জানি সেকথা
আমার ভালবাসার নির্যাসে গড়া,
স্বর্গের সুরভি দিয়ে মোড়া
ছেলেদের আমি যে বড়ই ভালবাসি,
ওদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষ দেখতে চাই
তাই আমি কিছুতেই কবি হতে চাই না ।

Cleveland, Ohio

Dust If You Must

Kathy Powers

Remember, a house becomes a home when you can write "I love you" on the furniture....

Dust if you must but wouldn't it be better
To paint a picture or write a letter,
Bake a cake or plant a seed.
Ponder the difference between want and need.

Dust if you must but there's not much time,
With rivers to swim and mountains to climb!
Music to hear and books to read,
Friends to cherish and life to lead.

Dust if you must but the world's out there
With sun in your eyes, and wind in your hair,
A flutter of snow, a shower of rain;
This day will not come around again.

Dust if you must and bear in mind,
Old age will come and it is not kind.
And when you go, and go you must,
You, at last, become the dust.

Kathy Powers - I lived 27 of my 65 life years clueless in a bipolar whirlpool when I wrote lists to settle my racing thoughts and my plans to save the world. From 28 to 58, I raised my son on my own and became keenly aware of human fragility and disability, especially in the area of housework. Here I remain at 65 years with an empty bucket list and a world to save.

Sassy's Magic

Malina Damjanovic

My dog Sassy had a certain magic,
She would run and come when called.

She would smile and look at you with
those big brown eyes. She was never sad,
always happy.

No matter what. And when she
went for a walk she would look at you. As if to say*what's up?*

It saddens me that Sassy will not be around for too much longer. Her health and age are against her.

Her spirit will live on forever in my heart.
Along with her heartwarming smile. And those big brown eyes. Those are the memories that will never set us apart.

For as long as I live, I will love her so,
And the magic she brought to my heart.
That only her and I know.

Malina Damjanovic - I grew up in Chicago. I studied English literature at Lake View High School and for a while at Loyola University. I took the class not expecting to do well in it. But to my surprise I did do very well and fell in love with Shakespeare and literature ever since.

A day in the life of America's Prime

Bianca Chatterjee

We live in a house that has been home to many. There are expensive masterpieces on every wall in every room. There are red velvet carpets in the bathroom and closets and great white columns, line the building's every inch. Security is my best friend and my red, pinstriped tie is my signature accessory. I am the current president of the United States of America and I couldn't have it any other way.

"Bills to sign. Bills. To. Sign. Bills to sign." The cigarette in my mouth moves as I muttered over and over again. I couldn't forget; hell, I never do. However, it's nice being reassured that you're an organised president, right? *A good president…*

Shiny black dress shoes padded over to me as I flicked the lighter over and over again, hoping for a flame.

"Mr President, you do realise that that *thing* hanging out of your mouth is a stick of cancer made from beaver arse?" Garrett's arms are crossed and his eyebrows are furrowed. My gaze turns towards him and I give him a *"yeah, so what?"* look, before fussing with the stupid lighter again.

"Lemme" he plucks the cigarette and away from me and lights it, before giving it back. Ribbons of smoke float away to the ceiling.

"We have a press conference in 10, sir. The gun control act means a lot to you, you can't miss this." He puffed out smoke and shifted his weight on his feet a couple times.

*** *** *** ***

"Hm, I'm going, lead me the way sergeant." I reply and walk ahead. He groans in annoyance and follows me.

The room was almost silent and the place smelt delicious. Old cherry wood (A/N: Fun fact; Obama likes the smell of cherry wood! Weird, right?). A fan above me whirred around at an inhumane speed and I reminded to get my dear Garrett to fix it for me. The rectangle table was in session and I was more than ready.

"So, the verdict is what? It's been 8 days, sir. 10 days is the cut off. You either sign this or not." The impatient senator clicks and twirls his pen in between his fingers and sighs. I do too.

A river of concentration floods through my veins and I furrow my brows, putting my hand over my mouth. So many factors here, so many negatives. So many pros and cons and…

"No." I murmur, hand remaining over my mouth. The senators sitting around me at the cherry wood, rectangle table, whisper and nod in secret satisfaction. A gasp from Garrett next to me is heard, and my foot revolts hard into his leg. Childish yes, but it is effective.

Be a good president…

"Well, well. Meeting adjourned then. It seems our beloved president has fallen from his high horse." The impatient senator sing- songs, getting the occasional snicker from the rest.

"We'll discuss this again. You won't win every time. America's law can be easily manipulated by me." I stand with as much confidence I could muster. My lungs feel as if they're oxygen free and my palms are grossly sweaty. A false smile is plastered on my face. Be calm, not sassy. Be professional, not Malia.

Fixing his ugly mustard tie, he too, stands and laughs cockily. His reminded me of a toad really, with his fat body and short limbs. He reaches for my hand, face falling a little when he grasped it.

Finally, after what seems like an eternity of awkward standing, shaking hand and tight lipped grins, security finally lets us free with a turn of a key and I dash out, Garrett running to catch up.

"Where are we going now, Pres?" he pants, folders and loose pages trying to escape his arms. Sunglasses are instantly put on my face and I stop him with my hand.

"Tell the driver to take me home. God, that senator really has an agenda." Garrett nod before clicking his tongue.

"By the way, your hands are *disgustingly* sweaty. Wow." He exaggerates with hands gestures and wide eyes.

*** *** *** ***

"Hey! I'm home." I bellow into the hospital-clean marble hallway. No answer. My shoes squeak ever so slightly as I pad down the hall, taking off my YSL and tucking them in my shirt. Looking around, I hear *thump, thump, thump.*

What? Did someone break in or something? That's impossible…

"WHO'S THERE?" A deepened voice blares from…the top floor? I look directly above me to the landing and see a hockey mask wearing, baseball bat armed Sasha.

"Hey baby girl. What's with the get up?" An face splitting grin stretches across my face and my arms are wide open. She clicks her tongue in chagrin and rolls her eyes, taking her Halloween costume off.

Sasha leaps down the stairs and crosses her arms in front of me. Her lower lip was pouted and her brows were smooched together.

"Oh. My. God, dad! I thought you were an imposter or something! I'm like, dying inside!" Her voice returns to high, squeaky, and as of now, irritated. Being the considerate father I am, instead of listening to her spiel, my arms envelope her in a bear hug.

"Can you listen to me for once? Ugh!" He mumbles in my shoulder. Sasha forcedly pulls away and tells me about her day. Apparently science is a real pain and algebra is something that needs to be made illegal. The Act of "Ew, Algebra", she calls it.

She tells me that Malia and Michelle have gone out and they've left her to finish English homework. Then, I hear about awkward incidents with a boy in her class, and how her teacher is wildly eccentric and does more talking than teaching. Her arguments were pretty convincing, I must say.

"You want pizza? I'll tell them to not put any pineapple on it." I interrupt her lecture about how she loves private school. Sasha stops in her tracks, thinks about it and nods before saying "Anyway…"

I grab the landline and the numbers bleep as I giggle at her jokes about the rules at school.

We live in a house that has been home to many. There are expensive masterpieces on every wall in every room. There are red velvet carpets in the bathroom and closets and great white columns, line the building's every inch. Security is my best friend and my red, pinstriped tie is my signature accessory. I am the current president of the United States of America and I absolutely couldn't have it any other way. Ever.

Bianca lives in Sydney, Australia with her parents and her younger brother, whilst attending year 8 in high school. Her hobbies consist of film making, drawing, sculpting, photography, writing and reading. Apart from her literary and creative endeavours, she also likes works in mathematics and science.

Bianca has written externally in a competition and another magazine before. When she was 9, Bianca won an award for a book review she wrote, which was reported in the local newspaper, St Mary's Star.

She adores creative writing and all it has to offer. Bianca's favourite genres to read are Horror, Thriller, Comedy and anything romantic. But when it comes to writing, she blogs poetry and writes narratives online.

She recently uploaded a short film on YouTube called *"//indefinable feelings//"*, which was written and produced by herself, as a participant of the Gifted and Talented programme in her school. Though before high school, she was selected for the prestigious Opportunity Class and through this, she was given the title of School Prefect.

মেমসাহেবের দিন

দেবীপ্রিয়া রায়

‘ঐ দেখ্ শিগ্‌গীরি আয় ! মেমসাহেব যাচ্ছে’ । নীচতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর বড় জানালার কাছ থেকে দিদিভাই উঁচু স্বরে ডাক দিল, সাথে সাথে আমরা দুই বোন পদ্মাবতী চম্পাবতীর সংসার গোছানো ফেলে দে ছুট ! পদ্মাবতী আর চম্পাবতীকে এই সেদিন রথের মেলা থেকে দাদু কিনে দিয়েছেন — ধপধপে সাদা প্লাস্টিকের সুন্দরী পুতুল । তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু, লাল টুকটুকে ঠোঁট, কাঁখে আবার কলসী । লাল পাড় শাদা শাড়ি লহর তুলে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে । তাদের দেখা মাত্র আমরা তাদের অসম্ভব ভালবেসেছি । এতদিন ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির জানালার ধারে ভাঙা টিনের ট্রাংকে পাতা আমাদের পুতুলের সংসারে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়ে তৈরী গিন্নি পুতুল, তার ছোট্ট ছেলে (সেও ন্যাকড়ায় তৈরী) আর তার ন্যাকড়ার বর নিয়ে আমাদের ঘরকন্না চলছিল । তাদের চোখ নাক ছোটপিসি মানে আমার ফুলপি কলম দিয়ে সুন্দর করে এঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ন্যাকড়ার ওপর কালি ধ্যাবড়ানো সেই চোখ মুখের সঙ্গে কি এদের তুলনা হয় ? মাস কয়েক আগে সেই গিন্নির বিয়ে হয়েছে পাশের বাড়ির নীচতলায় ভাড়া থাকা ছবির পুতুলের সাথে । খুব মজা হয়েছিল সেদিন । মা আর কাকি খুদে খুদে লুচি আর বেগুন ভাজা করে দিয়েছিলেন, শাঁখ বাজানো হয়েছিল — এক্কেবারে সত্যিকারের বিয়েবাড়ির মত । ছবিটা অবশ্য ভারি অসভ্যতা করেছিল । পুরো একপাতা রাংতার গয়না দেওয়ার জায়গায় সিগারেটের প্যাকেটের চক্‌চকে রুপোলি কাগজ দিয়ে কাজ চালিয়ে দিয়েছিল । বলে কিনা রাংতা পাওয়া যাচ্ছেনা । অথচ মোড়ের মাথায় গোষ্ঠবতীর দোকানে দু পয়সায় একপাতা রাংতা পাওয়া যাচ্ছে আমরা সেদিন চুলের রিবন কিনতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি । সেই রাগে দিদিভাই ওর বর পুতুলকে ফেরৎ দেয়নি । এই নিয়ে ইস্কুলে ছবির দলের সাথে এখন আমাদের আড়ি । ওর দলের মাদ্রাজি মেয়েটা বসন্তা নামের, সেদিন আমাকে আর ছোড়দিভাইকে দেখে পিছন ঘুরিয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুলে কাঁচকলা দেখিয়েছে পর্যন্ত । যাই হোক্, আমাদের তিন বোনের বাইরের কারুক্কে দরকার ও নেই । দিদিভাই আর ছোড়দিভাইয়ের বাবা মানে

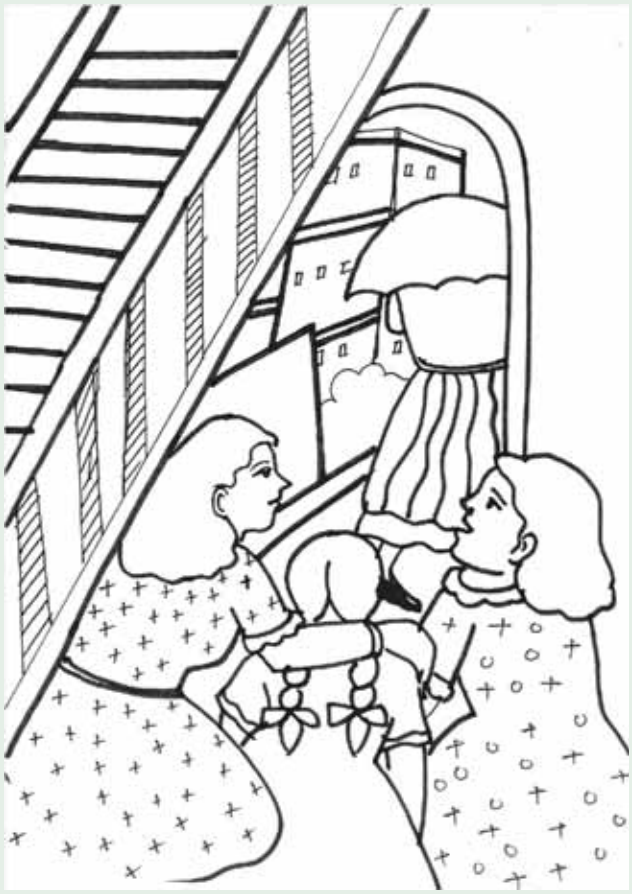

আমাদের বড় পিসেমশাই এগ্রিকালচারাল অফিসার — নানান্ গ্রামে গঞ্জে বদলি হতে হয়, তাই ওরা আমার দাদুর তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করে । ওদের সবচেয়ে বড় দিদিও এতদিন এখানেই ছিলেন । সম্প্রতি ডাক্তারি পড়তে হস্টেলে চলে গেছেন । আমাদের থেকে অনেক বড় তিনি আর খুব কড়া মানুষ । তাঁকে আমরা একটু একটু ভয় পেতাম । কিন্তু আমরা তিন বোন হরিহরাত্মা — দিদিভাই আমাদের দলপতি, আমি আর ছোড়দিভাই ওর ল্যাংবোট । তাছাড়া, আমাদের এই বাড়িতে এত লোকজন থাকে আর এত আত্মীয় স্বজন তাদের ছেলেপুলে নিয়ে দিনরাত্তির আসাযাওয়া করে যে সর্ব্বদাই হৈ চৈ লেগেই আছে । একজন বন্ধুর সাথে আড়ি হল তো বয়েই গেল । লেখাপড়ায় ভাল, হাতের লেখা ভাল, ভাল আবৃত্তি করতে পারে বলে পাড়া

প্রতিবেশী দিদিভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । তার খাতিরে আমি আর ছোড়দিভাইও তাই একটু বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই । তিন বোন একই ইস্কুলে পড়ি আমরা — বাড়ির থেকে হাঁটাপথ কালিধন ইনস্টিটিউশন তারই মর্নিং ক্লাসে যাই । সক্কাল বেলা চারটায় উঠে পড়া মুখস্থ করি দুলে দুলে, হাই তুলতে তুলতে ঘুম চোখে ঠাম্মা আমাদের বিনুনি করে দেন । তার পরে নীল স্কার্ট আর শাদা ব্লাউসে সেজেগুজে ডাকব্যাক লেখা ব্যাগ ঝুলিয়ে রওনা দিই । ওবাড়ির কালু আর ভুলু দাদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে উল্টাতে চেঁচিয়ে বলে, 'ফুটবল টিম বেরিয়ে পড়েছে' । একটু রাগ না করে পারা যায়না, তবে কালু দাদা হলো পাড়ার ছেলেদের হীরো, আমাদের থেকে ঢের ঢের বড় তাই কিছু না বলে চুপচাপ পা চালিয়ে যাই । ঝকঝকে রাস্তা তখন গঙ্গাজলের হাইড্রান্ট খুলে ধোয়া হয় । সেসব বাঁচিয়ে যেতে যেতে দিদিভাই বলে, 'সামনের বছরে তো কমলা গার্লস স্কুলে যাব, তখন আর ওরা কিছু বলবে না । দুপুরের ইস্কুল, সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে নয় নম্বর বাস ধরে একেবারে শাঁ করে চলে যাব ।' কিন্তু ঐ নয় নম্বর ধরতে হলেও তো ইউনিফর্ম পরে ঐ ফুটপাথ দিয়েই হেঁটে যেতে হবে, খালি ইউনিফর্মটা কমলা আর শাদা হয়ে যাবে । কেমন যেন সন্দেহ হয় যে কালু দাদারা দেখলে বোধহয় তখনও ক্ষেপাবে ।

আসলে সব দোষটাই বুলগানিন ক্রুশ্চেভ ফ্রকের । তখন অবশ্য বুঝিনি — গত বছর বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ এলেন কোলকাতায় । ভিড় করে সবাই দেখতে গেলাম আর তার পর যখন তাদের নামে নতুন প্যাটার্নের ফ্রক বেরুলো, তখন দাদু আমাদের তিন বোনকে ষষ্ঠীর দিন এক প্যাটার্নের জামা করিয়ে দিলেন । আমরা তো আহ্লাদে আটখানা । হাতকাটা বাসন্তি রঙের জামা আর তার উপর ফিকে নীলে হলুদ পাইপিং দেওয়া আলগা এক গোল বিব, সামনে কেমন বেশ সেই ফিতে দিয়ে বো বাঁধা । কিন্তু ও হরি ! আনন্দটা বড় স্বল্পায়ু হলো । জামা পরে বেরুনো মাত্র সামনের বাড়ির দাদারা আমাদের নামকরণ করে ফেল্লেন । এতসব ছোটখাট দুঃখ অবশ্য দুপুর হতে হতে ভুলে যাই । ইস্কুল থেকে ফিরে স্নান করি তিনজনে; ছোট্ট তিনটি বালতি নিয়ে নীচের চৌবাচ্চা থেকে হাপুস্ হুপুস্ জল ঢালি । ওপরের বাথরুমে শাওয়ার টাওয়ার সবই আছে, কিন্তু তাতে আমাদের মন ওঠেনা, কারণ তাতে একে একে স্নান করতে হয়; তিনজনে মিলে একসাথে স্নানের আনন্দ আলাদা । নীচের চৌবাচ্চায় দাদু অনেকসময় ঠান্ডা হওয়ার জন্য ডাবের ছড়া ডুবিয়ে রাখেন । অতিথি সজ্জন এলে আগে তাঁদের সেই ঠান্ডা ডাবের জল দেওয়া হয় । ডাব আসে আমাদের শহরতলীর বাড়ী ঢাকুরিয়া থেকে । সে বাড়ীতে যেতে হলে তখন দুইবার বাস বদল করতে হয় আর তার ও পরে মাঠ ঘাট ভেঙে হাঁটতে হয় বহুক্ষণ । আমার চাকুরে কাকারা সেই বাড়ীতে গিয়ে থাকলে তাঁদের অসুবিধা হয় । তাঁদের অফিস ডালহৌসি পাড়ায়, অতদূর যাতায়াত পোষায় না । আমরা সব্বাই তাই দক্ষিণ কলকাতার এই নিরিবিলি পাড়াটিতে থাকি । কিন্তু ঢাকুরিয়ার বাড়ি হতে নিত্য পুকুরের মাছ, গাছের ডাব, নারকেল, সুপারি এমন কি পেছনের বাগানে লাগানো কাটোয়ার ডাঁটা পর্যন্ত দাদু নিয়ে আসেন । যেদিন জলে ডাব ভাসেনা, সেদিন, ঠাম্মাকে খোসামোদ করে আমরা তিন বোন চৌবাচ্চায় নেমে পড়ে সাঁতার সাঁতার খেলি । দেরী করলে গুরুজনেরা কেউ বকাবকি করে আমাদের টেনে তুলে একথালায় ভাত খেতে বসান । খাইয়ে দাইয়ে চোখ রাঙিয়ে আমাদের খাটে শুইয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা খেয়ে শুয়ে পড়েন । বাড়ী নিঝুম হয়ে আসে - আমরা উস্খুস্ করি, পদ্মাবতী চম্পাবতী হাতছানি দেয় । দুপুর ঝিমঝিম করে এলে তবে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া যায় । দেশলাই বাক্স জুড়ে জুড়ে তাদের সোফা সেট তৈরী করি বসে বসে, তৈরী করি আলমারি আর টেবিল । পুতুলের সংসারেও রান্না খাওয়ার পাট চোকে, তারা তখন সেজেগুজে বেড়াতে যায় মেনকা সিনেমার সামনের ছোটলেকে, যেখানে আমরাও বিকেল হলে দাদুর সাথে হাঁটতে যাই । ঠিক আমাদের মতন করেই তারা শিরীষ গাছের ফুল ছেঁড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হ্যাঙ্গিং ব্রীজে চেপে দোল খায়, লিলিপুলে গিয়ে গোলাপি শাপলার ঝাঁজির ফাঁকে কালো কালো মাছের খেলা দেখে, আর ফেরার সময় ছোট্ট ঠোঙায় করে চীনেবাদাম নিয়ে বাড়ি ফেরে । ফেরার সময় ঠিক আমাদের মত তাদের সাথেও দেখা হয়ে যায় রেল লাইনের ওপারের বুদ্ধ মন্দিরের তিব্বতী লামার । সে নিজের মনে একটা ছোট্ট ঘন্টায় ঘা দিতে দিতে কি এক অজানা মন্ত্র আউড়ে যায় । তার কথা বোঝা যায়না । আমরা তাই ছাতের দড়িতে মেলে দেওয়া একখানা রঙীন শাড়ি টেনে জড়িয়ে সেই তিব্বতী লামা সেজে একটা থালা পেটাই আর মাথা নেড়ে বলি, 'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' । পদ্মবতীরা কি বোঝে জানিনা, তবে আমাদের মনে বেশ কৃতিত্বের ভাব জাগে ।

কিন্তু মেমসাহেব দেখার আনন্দের কাছে এসব আনন্দ ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায় । আমি তড়িঘড়ি সিঁড়ি ভাঙি, ছোড়দিভাই আমার আগে যেতে লাল সিমেন্টের রেলিংয়ে উঠে পড়ে সড়াক্ করে পিছলে নেমে যায় । আমি হাঁইমাঁই করে নেমে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মারি । সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে মানুষ সমান উঁচু জানলা, কোলে তার বসার তাক । দিদিভাই আগেই সেখানে জায়গা দখল করে বসে আছে । বাড়ীর সামনে ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে কবীর রোড অবধি চোখ চলে - সেই কবীর রোড ধরে মেম চলেছেন । আমাদের এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মেমসাহেব এগিয়ে গেছেন অনেকটা । শুধু রঙীন ছাতাখানা, সোনালী চুল আর স্কার্টের নীচে দুখানা ফর্সা পা - দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল । কিন্তু ঐটুকুতেই আমরা একেবারে বিমোহিত । সেদিন আর তারো পরে কয়েক দিন, আমরা কেবল মেমসাহেবের গল্পই করলাম । রেলিং বেয়ে নামতে গিয়ে ছোড়দিভাই যে রেলিংয়ের বাঁকে ঠাম্মার জলকাচা করে মেলে দেওয়া গামছা নিয়ে নেমে পড়ে অসভ্য চালচলনের জন্য বকা খেল, সেটা গায়েই মাখল না, যদিও এমনিতে একটু জোরে কথা বললেই সে কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্র করে । মেমসাহেব এমনি জিনিষ ! সাহেব সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের খুব রাগ, কারণ তারা আমাদের ২৫০ বছর ধরে চাকর করে রেখেছিল । মাত্র সাত বছর হল তাদেরকে তাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তার আগে তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে । ক্ষুদিরাম, সূর্য্য সেন, বাঘা যতীন - এদের গল্প শুনে শুনে সেই বয়সেই আমরা বিপ্লবী । সাহেব দেখলেই ঠ্যাঙাতে রাজী । তাছাড়া পথেঘাটে রিফিউজীর মেলা । আমাদের তো আবার অধিকাংশ আত্মীয় রিফিউজি । সবাই বলে যে দেশভাগটা সাহেবদেরই কীর্ত্তি । সাহেবের সাথে ভাবের কোন প্রশ্ন ওঠেনা । কিন্তু মেমের ব্যাপার আলাদা । তারা সাহেব নয়, বরং তারা কেমন পরীর দেশের থেকে নেমে আসার মত রূপ নিয়ে চারদিকে আলো ছড়িয়ে বেড়ায় । যদি মেম আবার এই পথে আসেন, এই ভেবে কয়েক দিন অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থেকে থেকে আমরা তিন বোনে পরামর্শ করলাম, বড় হয়ে যে করেই হোক্ মেমসাহেবদের দেশে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করতে হবে ।

তার পরে ৬০ বছর কেটেছে । আমাদের সেই লম্বা জানলা দিয়ে এখন আর কবীর রোড চোখে পড়েনা । মাঝখানে খোলা মাঠ খানিতে গোটা দুয়েক মাল্টিস্টোরিড উঠে আকাশের গায়েও বেড়া টেনে দিয়েছে । আমাদের সেই বাড়িতে কলরবে ভরা বাড়ীটিতে এখন মোটে একজন থাকেন — আমার ছোট কাকীমা । তিনিও বৃদ্ধা হয়ে এলেন । বাকীরা অনেকে পৃথিবীর পাট চুকিয়ে চলে গেছেন । আমরা তিনবোনেই এতদিনে অনেক মেমসাহেব কে চিনে নিয়ে বন্ধুত্ব করে ফেলেছি । কিন্তু সেই পরীর মতন মেমসাহেবকে আজও খুঁজে পাইনি কেউ ।

দেবীপ্রিয়া রায় - লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চ্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

ফুটবল

আলপনা গুহ

সেদিন বিকেলবেলা বোধিসত্ত্ব আমাদের অর্থাৎ ক্লাসের কয়েকজন বন্ধুকে ওর বাড়ীর কাছে একটা মাঠে আসতে বলেছে । বোধিসত্ত্ব আমার বন্ধু বেজায় মোটা, খেতে খুব ভালবাসে । বোধিসত্ত্ব আমাদের ডেকেছে কারণ ওর বাবা ওকে একটা নয় নম্বর ফুটবল কিনে দিয়েছে । সেই উপলক্ষে আমরা একটু আনন্দ করবো । বোধিসত্ত্বটা কি ভালো !

বিকেল তিনটের সময় মাঠে গিয়ে হাজির হলাম । আমরা রয়েছি আঠারোজন । এবার খেলার টিম ভাগ করতে হবে । প্রত্যেক টিমে সমান খেলোয়ার চাই । রেফারি বাছাই সোজা কাজ । আমরা অয়নকে ঠিক করলাম । অয়ন আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আমরা ওকে ঠিক পছন্দ করি না । কিন্তু ও চশমা পরে বলে ওর মাথায় গাঁট্টাও মারতে পারি না । রেফারি হওয়ার জন্য অয়নই উপযুক্ত । তাছাড়া কোনো দলই ওকে চাইবে না । কারণ ফুটবল খেলার পক্ষে ও বড্ড দুবলা পাতলা, কথায় কথায় কেঁদে ফেলে । কিন্তু অয়ন যখন বাঁশি চেয়ে বসলো তখনি হলো মুশকিল । আমাদের মধ্যে একমাত্র রূপকেরই বাঁশি আছে । কারণ ওর বাবা পুলিশ ।

রূপক বললো, ''আমি বাঁশি ধার দিতে পারবো না । এটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি ।'' রূপক কিছুতেই রাজি নয় । বাঁশি কাছছাড়া করতে । শেষে ঠিক হল বাঁশি বাজানোর দরকার হলে অয়ন রূপককে বলবে তখন রূপক অয়নের হয়ে বাঁশি বাজাবে ।

'এবার আমরা খেলবো না কি করবো ? আমার খিদে পেয়ে গেছে ।' চেঁচায় বোধিসত্ত্ব । কিন্তু ব্যাপারটা এবার জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে । আঠারো জনের মধ্যে অয়ন রেফারি হওয়াতে খেলোয়াড়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরো । সংখ্যাটা সমান ভাগের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয় । যা হোক শেষ পর্যন্ত আমরা একটা উপায় খুঁজে পেলাম । খেলায় লাইনসম্যান থাকে, যে মাঠের বল বেরিয়ে গেলেই একটা ছোট্ট পতাকা নাড়ে । একাজের জন্য মৈনাককে বাছাই করা হলো । একজন লাইনসম্যানের পক্ষে সারা মাঠটার ওপর রাখা খুব মুশকিল । কিন্তু মৈনাক খুব জোরে দৌড়াতে পারে । খ্যাংড়া কাঠির মতো সরু লম্বা পা আর ঢিবির মতো মালাইচাকি । মৈনাকের কোনো কিছু শেখার আশ্রহ নেই, ও শুধু বল পেটাতে ভালবাসে ।

মৈনাক ফার্স্ট হাফের জন্য লাইনসম্যান হতে রাজি হোলো । কিন্তু ওর কাছে তো পতাকা নেই, জানালো মৈনাক। তাই পতাকার জন্য ওর বিচ্ছিরি নোংরা রুমালটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে । ও তো আর বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় জানতো না ওর রুমালটা দিয়ে পতাকার কাজ চালাতে হবে । তাহলে না হয় পরিষ্কার রুমাল নিয়ে আসতো ।

''তাহলে খেলা শুরু ?'' চেঁচায় বোধিসত্ত্ব ।

এরপর তো টিম ভাগের কাজটা সহজ । আমরা রয়েছি ষোলো জন । প্রত্যেক ফুটবল দলে একজন করে ক্যাপটেন থাকে । কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের টিমে সবাই ক্যাপটেন হতে চায় । সবাই, শুধু বোধিসত্ত্ব বাদে । বোধিসত্ত্ব গোলে দাঁড়াতে চায় কারণ ও দৌড়াদৌড়ি একদম পছন্দ করে না । বোধিসত্ত্ব বেশ বড়োসড়ো চেহারার, গোলের অনেকটাই ওর শরীরে ঢেকে যায় । ওকে বাদ দিয়ে বাকি থেকে যায় পনেরো জন ক্যাপটেন । দরকারের চেয়ে অনেক বেশি । ''আমার গায়ে সবচেয়ে বেশি জোর'' । চেঁচায় পার্থ, ''আমি ক্যাপটেন হবো । আর যে আমাকে মানবে না তার নাকে মারব এক ঘুঁষি'' । আমি টস করার আইডিয়া দিলাম টস করতে গিয়ে আমাদের দুটো পয়সা লাগলো । কারণ প্রথমবার পয়সাটা ঝোপের মধ্যের পড়ে হারিয়ে গেলো । আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না । জয়দীপের কাছ থেকে পয়সাটা ধার নেওয়া হয়েছিল, পয়সা হারানোয় জয়দীপ মোটেও খুশি নয় । ও খালি পয়সাটা খুঁজতেই লাগল । শেষে রাজা কথা দিল ওর বাবাকে বলবে একটা চেক লিখে দিতে । শেষমেশ দুজন ক্যাপটেন ঠিক হলো । রাজা আর আমি । 'শোন, বড্ডো খিদে পেয়েছে' । চেঁচায় বোধিসত্ত্ব, 'তোরা কি খেলবি'?

সংকলন

যা হোক দল তৈরী শেষ হোলো । সবাই খুশি । খালি পার্থ ছাড়া । আমি আর রাজা দুজনেই পার্থকে দলে চাই কারণ ও যখন বল নিয়ে দৌড়ায়, কেউ ওকে আটকাতে পারে না । পার্থ যে খুব ভাল খেলে তা নয় । কিন্তু সবাই ওকে ভয় পায় । এদিকে জয়দীপ ওর আগের পয়সাটা খুঁজে পেয়েছে, তাই খুব ফূর্তি । আমরা আবার জয়দীপের কাছে পয়সাটা ধার চাইলাম, পার্থ কার টিমে যাবে টস করে ঠিক করার জন্য । আমাদের দ্বিতীয় পয়সাটা আবার এর মধ্যেই হারিয়ে গেলো । জয়দীপ ফের পয়সাটা খুঁজতে লেগে গেলো — এবার ও সত্যি সত্যি খুব রেগে গেছে । এবার টসে রাজা জিতলো, ওর টিমে পার্থ । রাজা পার্থকে গোলে দাঁড় করালো । কারণ ওর মতে তাহলে কেউ আর গোলের কাছে ঘেঁষতে সাহস করবে না, ফলে গোলে বলও ঢুকবে না । পার্থ কিন্তু মোটেও খুশি হলো না । এদিকে পাথর দিয়ে মার্কা করা গোলের ভিতর দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্ব বিস্কুট চিবুচ্ছে, হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে বেশ রেগে আছে । ''কি রে তোরা খেলবি ?'' আবার চেঁচায় বোধিসত্ত্ব ।

আমরা মাঠে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম । গোলকিপার বাদ দিলে প্রত্যেক টিমে সাত জন করে খেলোয়াড় নেই । তাই পজিশান ঠিক করা মোটেও সহজ কাজ নয় । কেউই সেন্টার ফরওয়ার্ড হতে রাজি নয় । জয়দীপ রাইট ব্যাকে দাঁড়াতে চায় । কারণ মাঠের ঐ কোনায় ওর পয়সাটা পড়ে গেছে । খেলতে খেলতে ও পয়সাটা খুঁজতে চায় । রাজার টিমে তাড়াতাড়ি পজিশান ঠিক হয়ে গেলো কারণ পার্থ সবার নাকে এক ঘা করে ঘুঁষি মারছিল । পার্থর ঘুঁষি খেয়ে ফোলা নাক নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো । পার্থর ঘুঁষির জোর আছে বটে । আমার টিমে কিছুতেই ঝগড়াঝাঁটি মিটছে না দেখে পার্থ শেষপর্যন্ত খেলোয়াড়দের নাকে এক ঘা করে ঘুঁষি বসানোর ভয় দেখালো । অমনি সব সুড়সুড় করে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো ।

অয়ন রূপককে বললো, ''বাঁশি বাজা'' । অমনি রূপক খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়ে দিল ।

রাজা মোটেও খুশি নয় । ও বললো, ''এটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না । আমাদের চোখে রোদ পড়ছে । আমরা কেন মাঠের বাজে দিকে খেলবো ?'' আমি উত্তরে বললাম, সূর্য তো আর আমাদের খেয়াল খুশি মতো চলবে না । বরং ওরা

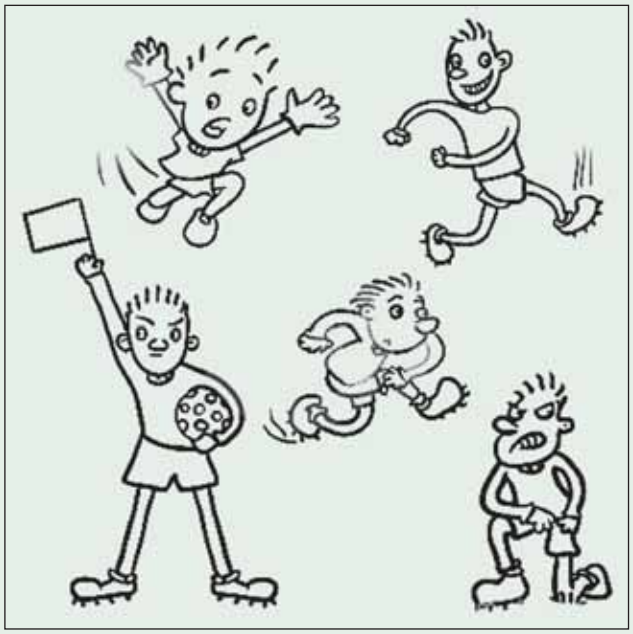

যদি চোখ বন্ধ করে খেলে তাহলে ভাল খেলবে । ব্যস, লেগে গেলো হাতাহাতি । রূপক জোরে বাঁশি বাজিয়ে দিল ।

''আমি তোকে বাঁশি বাজাতে বলি নি'' চেঁচিয়ে ওঠে অয়ন, ''রেফারি তো আমি'' । তাতে রূপকের কিছু এসে যায় না । রূপক বললো, বাঁশি বাজানোর জন্য অয়নের পারমিশানের দরকার নেই । ওর যখন খুশি তখন বাঁশি বাজাবে । এই না বলে পাগলের মতো এক নাগাড়ে বাঁশি বাজিয়ে যেতে লাগলো । ''তুই একটা পাক্কা শয়তান'' এই বলে অয়ন কাঁদতে শুরু করে ।

''এই যে ছেলেরা'' গোলে দাঁড়িয়ে চেঁচায় বোধিসত্ত্ব । কিন্তু কেউ ওর কথা শোনে না । আমি রাজার সাথে মারামারি চালিয়ে যেতে থাকি । আমি ইতিমধ্যে খামচা মেরে ওর নীল রঙের বাহারে জার্সি ছিঁড়ে ফেলেছি । 'বয়েই গেছে, কিসসু হবে না । আমার বাবা এরকম আর একটা কিনে দেবে' । এই না বলে রাজা আমার গোড়ালিতে এক লেঙ্গি মারে । রূপক অয়নের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে । আর অয়ন চেঁচাতে থাকে, 'আমার চশমা, আমার চশমা' । এদিকে জয়দীপ এসব গন্ডগোলের মধ্যে মাথা না ঘামিয়ে এক মনে ওর পয়সাটা খুঁজে যাচ্ছে ।

বেচারা পয়সাটা এখনো খুঁজে পায় নি ।

পার্থ চুপচাপ গোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে । যে ওর গোলের কাছাকাছি আসছে তার নাকেই গদাম করে এক ঘুঁষি

বসাচ্ছে। মানে ঘুঁষি খাচ্ছে ওর নিজের টিমের খেলুড়েরাই। সবাই মিলে চিৎকার করছি, দৌড়োচ্ছি-দারুন মজা !

এর মধ্যে বোধিসত্ত্ব চেঁচিয়ে ওঠে, 'এবার থাম তোরা সবাই' পার্থ রেগে গিয়ে বলে, 'তুই তখন থেকে খালি কখন খেলবি, কখন খেলবি করছিস। আরে বাবা আমরা তো খেলছিই। তোর কিছু বলার থাকলে হাফ টাইমের পর বলবি।'

'কিসের হাফ টাইম ?' বলে ওঠে বোধিসত্ত্ব, 'আমাদের তো ফুটবলই নেই। বলটা তো ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছি'।

Le Petit Nicolas এক অতি জনপ্রিয় ফরাসি শিশু সাহিত্য সিরিজ। René Goscinny এর স্রষ্টা, ছবি এঁকেছেন Jean-Jacques Sempé, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯ সালে। পঞ্চাশের দশকের ফ্রান্সের শিশুদের শৈশবের ছবি ফুটে উঠেছে এই সিরিজের গল্পগুলিতে।

আলপনা গুহ কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা অনার্সের স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, দিল্লির Alliance Francaise থেকে ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম পলিটিক্যাল বিভাগে বাংলা অনুবাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। নানা দেশ বিদেশ ঘুরে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে পার্থের বাসিন্দা, এখানেও তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুবাদকের কাজ করছেন।

Chicago, IL

স্থানীয় ট্রেন ও জানালার ধার

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

'সরুন সরুন মশায়-আমরাও অনেকক্ষণ ধরে বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছি – আপনি সুড়ুৎ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে আগে উঠে পড়লেন যে বড় ?' কালো কোট, মাথায় টুপি হাতে দস্তানা পরা ভদ্রলোক হৈ হৈ করে উঠলেন। হিমশীতল ভোরের জমাট নৈঃশব্দ্য মুহূর্তে খান খান। শিকাগো শহরতলীর একটি ট্রেন স্টেশন। জানুয়ারী মাস। স্থানীয় নিত্যযাত্রীরা তাদের নির্দিষ্ট ট্রেনটির আশায় অপেক্ষারত। ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে সব। যেন অ্যান্টার্কটিকার পুরুষ পেঙ্গুইনদের কলোনি। অপরিচয়ের বাধা পার হয়ে যতটা কাছাকাছি আসা যায় আর কি ! উত্তুরে হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচতে একটু উষ্ণতা হল প্রত্যাশা।

আমার গলার স্বর এমনিতে মোটেই মিহি নয়। কিন্তু কারো কথার জোরাল উত্তর দিতে গেলেই যে কেন চিঁ চিঁ করে উঠি কে জানে। আমার পরিচিত মানুষজনেরা বলেন এ হেন আমি যে কিনা পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি সব বয়সের সব রকমের নারী পুরুষের সঙ্গে অনর্গল বেশ স্পষ্টভাবে কথা বলে যেতে পারি, চাপান উতোরের সময় সেই আমিই নাকি তোতলাতে থাকি। এক্ষেত্রে নিজেই তার যথাযথ প্রমাণ পেলাম। বেশ গুছিয়ে ভাবনা চিন্তা করে একধারে সরে গিয়ে ক্ষীণ গলায় ভদ্রলোককে জানালাম, 'আজ্ঞে ঠিক ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য নয়। ট্রেনে ওঠার তাড়া জানালার ধারটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে।' ততক্ষণে মন্তব্যকারী ভদ্রলোকটি ঢুকে পড়েছেন ট্রেনের কামরার ভিতরে। তাঁর পিছন পিছন আরো প্রায় জনাদশেক। আমি গুটি গুটি পায়ে অবশেষে যখন উঠলাম ট্রেনে মনে গভীর উদ্বেগ ঘনিয়ে এল। আর সেই উদ্বেগে একটু আগে আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্য বা তার লাগসই জবাব সব গেলাম ভুলে।

ট্রেনের কামরাটি লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট। তার দু ধারে সারি সারি বসার সীট। কামরার মাঝ বরাবর হাঁটার জন্য খালি জায়গা। প্রত্যেকটা সীটে দুজন করে বসতে পারেন। একজন জানালার ঠিক পাশে আর অন্যজন তার পাশে। সুতরাং জানালার ঠিক পাশটিতে বসতে না পারলেও জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার কোন অসুবিধেই নেই। ট্রেনের কামরাটিতে আগাগোড়া চোখ চালিয়েও সে দিন একটিও জানালা ধার খালি দেখতে পেলাম না। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। মনে হতে লাগল আজ আমার দিনটা 'ষোল আনাই মাটি।' ধর্মে কর্মে এমনিতে আমার মতি নেই বিশেষ। কিন্তু আপৎকালে বিপত্তারণ মধুসূদনের নাম স্মরণে আমি তৎপর। রাধামাধবের শরণাপন্ন না হলে যে সে দিন জানালার ধারের সীটটি আমার কপালে জুটবে না এ ব্যাপারে আমি তখন নিঃসন্দিগ্ধ। তাঁর একশ আটটি নামের মধ্যে যে কয়টি সে মুহূর্তে মনে পড়ছে আওড়ে চলেছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। 'হরি হে ! তুমই সত্য !' সীট একখানা পেয়েও গেলাম জানালার ধারে। একজন নিত্যযাত্রী হঠাৎ করে সরে এলেন জানালার পাশের জায়গাটি থেকে। আমিও সেই তালে চট করে ঢুকে পড়লাম সেখানে।

বেশ গুছিয়ে বসে গলার স্কার্ফটি খুলে কোলের উপর রেখে পিঠের ভারী ব্যাগটা যেই না নামাতে যাব ওমনি আর এক দফা বিপত্তি। আমার পাশের যাত্রীটিকে মনে মনে এতক্ষণ ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম জানালা ধারটি ছেড়ে বসার জন্য। তিনি কিন্তু এবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'ঠিকমতো সামলাতে না পারলে এত ভারী ব্যাগ নিয়ে যাতায়াত করা কেন বাপু ?' ভারী শীতপোষাকের আড়ালে মানুষজনের চেহারা ভাল বোঝা যায় না। গলার স্বরে মালুম হল ইনি সেই দরজারক্ষী যিনি একটু আগেই আমার আচরণে ভারী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমার সাধ্য অল্প কিন্তু সাধ অনেক। ট্রেনে যাতায়াতের পথে পড়ব বলে রোজই পিঠব্যাগে বোঝাই করে নিয়ে যাই গাদা গাদা বই। প্রায়শই সে সব বই-এর অনেক পাতা না উল্টান থেকে যায়। তাও তারা থাকে সঙ্গে। প্রিয়স্পর্শের মতো পিঠে তাদের বোঝাটুকু না থাকলেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এ ক্ষেত্রে ভুল আমারই। তাই ক্ষমা চাইলাম পার্শ্ববর্ত্তীর কাছে। সব সামলে বসে জানালার কাঁচে চোখ লাগাতেই কানে এল, 'মেট্রা ট্রেনে বুঝি এই প্রথম চড়া হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'বুঝেছি। মাঝেমধ্যে চড়া হয়। তাইজন্যই জানালার ধারটির জন্য এত আগ্রহ।' বেশ বুঝদার ভঙ্গীতে বললেন

ভদ্রলোক। তাঁর কথার প্রতিবাদ জানাতে বেশ একটু মায়াই হচ্ছিল। আহা ! তাঁর এমন সুনিশ্চিৎ ধারণাটিতে আঘাত হানব ? তাও মিনমিন করে বলেই ফেললাম, 'তা প্রায় বছর আষ্টেক হতে চলল – সকাল সন্ধ্যে এই পথেই যাতায়াত।'

এবারে সহযাত্রীর চোখ কপালে ওঠে। হয়ত আমার মাথার সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দেয়। 'এই তো কালিঝুলি আকাশ আর তার গায়ে ঠেসান সরু সরু ন্যাড়া ডালপালা। এর মধ্যে দেখার আছেটা কি যে জানালার ধার নিয়ে এ হেন মাথাব্যাথা ? বছরের অন্য সময় হলেও বা বোঝা যেত।'

এবার আমার চুপ থাকার পালা। সত্যিই তো। দেখার মতো কিই বা এমন আহামরি দৃশ্য বাইরে ? ঘোলাটে আকাশ। চারপাশে মসৃণ চাদরের মতো জড়ান অন্ধকার। ক্রমশঃ অন্ধকার সরে গিয়ে ফুটে ওঠে মরা আলো। একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে ন্যাড়া গাছের মাথা, ঘরবাড়ীর চাল। একসময় ভোরের আলো নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। তখন 'কাল রাতি' যায় 'ঘুচে।' চারদিক আলোকিত। হলই বা মরা, আলো তো ? রাতের শেষে একটা নতুন দিনের শুরু। আর আমি সেই সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। এ কি কম সৌভাগ্য আমার ? এই সৌভাগ্যের আকাশে কাল মেঘের সম্ভাবনা মাত্রেই তাই মন উতলা। আকাশ, আলো, মাটির এ রোজকার খেলা। খেলার নিয়ম বদলায় না। বদল হয় খেলুড়েদের কেরামতি আর দর্শকদের মনের চোখ।

'কাল ছিল ডাল খালি / আজ ফুলে যায় ভরে।' আর কিছুদিন পরেই আজকের ন্যাড়া গাছগুলোয় ঝেঁপে আসবে পাতা। চারদিক তখন সবুজে সবুজ। একটুখানি হাত বাড়ালেই যেন পাওয়া যাবে অনেকটা সবুজ। মাটির আঁচলে ছড়িয়ে পড়বে 'রোদের সোনা।' ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে নালাটার অস্তিত্ব এখন আছে কি নেই তা নিয়েই সন্দেহ জাগে বৃষ্টির জলে ভরে কলকলিয়ে বয়ে চলবে সেও। তার কালচে সবুজ জল ফুঁসে উঠবে। সেই নালার সঙ্গে দেখা আমার মাত্র মিনিটখানেকের জন্য। তাও ভারী বেশী করে চোখে পড়ে তার এই রূপবদল। তারপর শুরু হবে গাছের পাতায় রঙ লাগার পালা। লাল, কমলা, বেগুনী, হলুদ – ঝরে যাওয়ার আগে বিচিত্র প্রাণের খেলা এ এক। আকাশের নীল তখন অমলিন। তার বুকে মাঝে মাঝে ভেসে চলবে সাদা মেঘের পালতোলা নৌকো। তারপর আবার সেই ন্যাড়া গাছ আর কালিঝুলি আকাশ। প্রকৃতির এই বছরোয়ারি খেলাও অজানা অদেখা নয়। তাহলে ? জানালার ধারে বসার কিসের এত নেশা হে তোমার ?

তা বললে হবে কেন ? এই যে অন্ধকার সরে গিয়ে আলো ফোটা – সে আলো এক এক দিন এক এক ভাবে রাঙায় যে সব। গাছের সঙ্গে, জলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে আকাশের আলোর এ খেলা আবহমান কিন্তু নিত্যনতুন। পরপর কোন দুটো দিন তো আর এক রকম নয়। তাছাড়া জানালা দিয়ে শুধু কি বাইরে দেখা ? এ হল বাহির পানে চোখ মেলে নিজের গভীরে ডুব দেওয়া। এইটুকুই তো সময় তার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবনের তরঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে চারধারে। ব্যস্ত বাস্তবতার ছোঁয়া লাগবে সবখানে। এইটুকু সময় শুধু নিজের মধ্যে নিজে থাকা – 'ওই গাছেদের মতো ঘাসে, পাতায়, ফুলে, ফলে, ছায়াতে, মাটিতে, রোদ্দুরে যুক্ত হয়ে থাকা'। জানালার ধারে বসার লোভ ছাড়ি কি করে ? মৃদু হেসে তাই সহযাত্রীকে উত্তর দিলাম, 'ওই একটা অভ্যেস আর কি ! আপনার অনেক অসুবিধে হল আজ আমার জন্য। দুঃখিত।' পার্শ্ববর্তী এবার নিরুত্তর। ট্রেন চলেছে আপন গতিতে। সরে সরে যাচ্ছে টুকরো মেঘ, গাছেদের সারি, বাড়ী ঘর, স্টেশনে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত সময়ে।

ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে পথ। এক সময়ে ট্রেন পৌঁছে যাবে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। শেষ স্টেশনে ট্রেন থামার একটু আগে উঠে দাঁড়ালাম। এবারে নামার পালা। সীট ছেড়ে আইলে দাঁড়াতে যাচ্ছি যাতে ট্রেন থামলেই নেমে পড়তে পারি। আমার পাশে বসা ভদ্রলোকটি আবারও বিরক্ত হলেন। নিবিষ্ট মনে কিছু একটা করছিলেন। আমি উঠে দাঁড়াতে সেটায় বাধা পড়ল। কিন্তু তিনি সরে না বসলে আমার বের হওয়ার উপায় নেই। আবারও ক্ষমা চাইতে তাঁর দিকে তাকাতেই ভাল করে চোখে পড়ল, কোলে ল্যাপটপ, কানে হেডফোন। বিরক্ত তাঁর হওয়ারই কথা। ইলেকট্রনিক্স-এর জগৎ থেকে মিনিট খানেক আগে তাঁকে সরে যেতে হল আমার জন্য। বুঝলাম এইজন্যই হয়ত ট্রেনের জানালার বাইরে চলন্ত ছবির তেমন আকর্ষণ নেই তাঁর কাছে। জানালা তাঁরও আছে। তবে সে হল screen operation window. আর সেই window ছিটকিনি তুলে দিয়েছে অন্য সব জানালায় যেখান দিয়ে চলকে পড়ে আকাশের নীল, ভোরের আলো, গাছপালার সরসতা। নিজের মনে হেসে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে পড়লাম আর একটি কর্মব্যস্ত দিনের মোকাবিলায়।

উইদাউট আ প্রিফেস

ইন্দ্রানী দত্ত

আঙুলের ছোঁয়া লাগছিল মুখে, কখনও চোখ কখনও নাকের পাশে। আলগোছে। হাল্কা ছোঁয়া। অথচ শিরশির করছিল শরীর। সমস্ত শরীর। আঙুলের নখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল কানের পাশের গাল। আলতো। চন্দনের ঘ্রাণ আসছিল। চোখ বুজে আসছিল কপালে ঈষৎ সূচালো কিছুর স্পর্শে। সে স্পর্শ যেন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত কপালকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। ও চোখ খুলতে চাইল। চোখের পাতা ভারি ঠেকল। সামনে দেখল হালকা কচি কলাপাতা রং, লাল পাড়ে ঘেরা। দৃষ্টি ঈষৎ নামিয়ে নিজেকে দেখতে চাইল এবারে। লাল বেনারসীতে দেখল নিজেকে। গভীর বিস্ময়ে। দেখল কনেচন্দন পরানো হচ্ছে তাকে। কচি কলাপাতাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে গেল সে। হাওয়ায় তালাস করে ফিরল তার হাত। ভারি হয়ে এল তারপর। হাত। সর্বশরীর। কোন এক বিপুল উচ্চতা থেকে পতন হতে থাকল। সে পড়ছে তো পড়ছেই। আতঙ্কে দমবন্ধ হয়ে এল যেন। মুহূর্তকাল।

ধরমড়িয়ে উঠে দেখল পাশে ঘুমন্ত সুদীপ। দেখল হাল্কা রাত আলো। দেখল তার খাট বিছানা। তার ঘরদোর। বিনবিনে ঘাম হচ্ছিল তার। কম্বল সরিয়ে বাথরুম গেল। জল খেল। জানলার ব্লাইন্ড সরিয়ে দেখল সাইডওয়াকে জমা বরফ। নিষ্পত্র গাছ। স্ট্রীটলাইট। গত বিশ বছরের চেনা দৃশ্য। ও বিছানায় ফিরে গেল। কম্বলের তলায়। ঈষৎ পা ঘষল। ঘুমন্ত সুদীপের পিঠে হাত রাখল আলগোছে। তারপর ভাবতে চাইল কে চন্দন পরাচ্ছিল তাকে। কচি কলাপাতা শাড়ি। লাল পাড়। ভাবতে চাইছিল। সমস্ত স্বপ্নটাকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছিল মনে মনে। সুদীপ জড়ানো গলায় কিছু বলল। কাশল ও ঘুমে ডুবে গেল আবার।

ওর ঘুম ভাঙল ঘড়ির অ্যালার্মে। ভোর পাঁচটায়। সুদীপ তখনও ঘুমোচ্ছে। চোখ খুলেই মনে হল ওর নতুন চাকরি, আজ প্রথম দিন। কম্বল সরালো, বালিশ থেকে মাথা তুলল ও। সুদীপ ওর হাত ধরল তখনই।

— এখনও রেগে আছ ?

— দেরি হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ো উঠতে দাও।

— দপদপাইয়া হাঁটে নারী / চোখ পাকাইয়া চায় — ঘুম থেকে উঠছ না পেনাল্টি কিক মারছ ? শোনো, না চাইলে যেও না। ফোন করে দিও। পরে ফরমাল একটা চিঠি দিয়ে দিও — চাকরিতে জয়েন করছ না তুমি ডিউ টু — যা ইচ্ছে লিখে দিও।

— ইন্টারভিউ দিয়েছি। অফার অ্যাকসেপ্ট করেছি। তুমিই জোর করলে চাকরীর জন্য। এখন এসব কথার মানে হয় না। ছাড়ো। সুদীপ আবার কাশে। হাত ছাড়ে। পাশ ফিরে শোয়। সিংহের কেশরের মত চুল ওর। অনেকটাই রুপোলী। চওড়া কাঁধ। পিঠ। স্বাতী হাত রাখে সুদীপের চুলে। বিছানা ছেড়ে ওঠে। ও বেশ লম্বা। বাঙালী মেয়ের গড় উচ্চতা ছাড়িয়ে পাঁচ পাঁচ হবে। আজকাল রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ওর মনে হয় ও যেন আর তত লম্বা নয় — বেঁটে হয়ে যাচ্ছে যেন। সুদীপ হাসে। বলে — আত্মবিশ্বাসের অভাব, স্বাতী। স্রেফ ল্যাক অফ কনফিডেন্স।

স্বাতী পায়ের আঙুলে ভর দেয়, গোড়ালি উঁচু করে। একবার দুবার তিনবার। দু হাত তোলে শূন্যে। সামান্য হাঁফায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সুদীপ হাসছে। রাগ নাকি অভিমান ফণা তোলে। দুপ দুপ করে হেঁটে বাথরুমে ঢোকে ও। আর এক ঘন্টা পরে স্বাতী যখন রেল স্টেশনে ওর গাড়ি পার্ক করবে, টিকিট কাউন্টারে গিয়ে মান্থলি রেল পাস চাইবে, সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ট্রেনের অপেক্ষা করবে তখন ওর আর মনে পড়ছে না স্বপ্নের কথা। নতুন চাকরি। একটা সুপারমার্কেটের মার্চেন্ডাইস সেকশনের সেলসের কাজ। স্বাতীর একটু ভয় হয় — পারবে তো ও ? কোনদিন চাকরি করেনি এ দেশে আসা পর্যন্ত। গত ছয় মাস সুদীপ জেদ করেছে প্রবল। এরকম জেদ করতে স্বাতী দেখেনি আগে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেষ, অন্য শহরে নিজের মত থাকে তারা। এখন তুমি কি করবে স্বাতী ? এভাবে

বাড়িতে বসে থেকে কি করবে তুমি ? কোনদিন চাকরি কর নি । ছোট থেকে শুরু করো, একটু কনফিডেন্স আসুক তারপর তোমার যোগ্যতা, তোমার পছন্দ মত কাজ খুঁজে নিও ।

স্বাতী তর্ক করেছে । ঝগড়া । রাগ । অবশেষে মেনে তো নিল । কেন যে মেনে নিল নিজেও জানে না । গত ছ-মাসের পুরোনো কথা মনে আসছিল ট্রেনে বসে, ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল নিজের অজান্তেই । কপালে ভাঁজ পড়ছিল । ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল কপালে আলতো আঙুলের ছোঁয়া, চন্দনের ঘ্রাণ – রাতের স্বপ্ন । সময় হিসেব করে দেখল কস্তুরীর এখন বিকেল হয়ে এসেছে । অফিসে ব্যস্ত হয়তো । তবু কথা বলতে তীব্র ইচ্ছে হল স্বাতীর । সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা টানেলে ঢুকল । নো সিগনাল । লম্বা টানেল পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন । এবারে নামতে হবে স্বাতীকে । টানেল আসবার সময়টা আন্দাজ করে নিল ঘড়ি মিলিয়ে । স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ । বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর – কাঁচ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শিরশিরে একটা কাঁপুনি এল শরীরে । একটা এস এম এস করল কস্তুরীকে – শুরু করলাম । সুদীপকে ফোন করে বললো – পৌঁছে গেছি ।

সেদিন কস্তুরী যখন ওর অফিস থেকে বেরোলো, তখন সন্ধ্যা নেমেছে । বাহাদুর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল । বেশ অনেকক্ষণ এসেছে । নীল মারুতি ভ্যানের ওপর খানিক আগের আঁধির ধুলো । হাল্কা পরত । ঝড়ের শুকনো পাতা বৃষ্টির হাল্কা ছাঁটে আটকে আছে । বাহাদুর লাল ঝাড়ন দিয়ে মুছছে গাড়ি ।

গাড়িতে উঠে বসল কস্তুরী । ব্যাগ নামালো কাঁধ থেকে । বাঁহাটুটা সামান্য খচ করে উঠল । রোজ যেমন হয় গাড়িতে ওঠার সময়টায় । ড্রাইভারের আয়নায় নিজেকে দেখল ও । গোল মুখ কপালে বয়সের ভাঁজ । দু এক গুচ্ছ পাকা চুল । ও আলতো আঙুল চালালো চুলে । বাহান্ন হ'ল ।

মোবাইলটা বাজল তখনই । ব্যাগ থেকে ফোন বের করতে গিয়ে হাত ফস্কে গাড়ির মেঝেয় । মোবাইলে এখনও অনভ্যস্ত কস্তুরী । রিং হচ্ছিল তখনও । তার মানে স্বাতী । আর কেউ না ।

কি রে ব্যস্ত ? এতক্ষণ লাগল ফোন ধরতে ?

– আমার কান্ড ! ধরতে যাবো । হাত ফস্কে মাটিতে । না না ভাঙেনি । এই তো ফিরছি অফিস থেকে । এই তো পাঁচ মিনিট । হ্যাঁ আজ একটু আগে । বাজার করার আছে । মাছ টাছ । তোর কাজ কেমন চলছে আগে বলবি তো ।

– ভালো । ভীষণ ভালো লাগছে ।

স্বাতী এইখানে বেশ উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে ওর ভাল লাগার কথা বলতে থাকে । আটলান্টিক পেরিয়ে সেই ভালো লাগা, ওর উত্তেজনা পৌঁছে যেতে থাকে কস্তুরীর কানে । খুশী হবে কি না ভাবতে হয় কস্তুরীর । মার্চেন্ডাইস গুছিয়ে রাখা, কাস্টমারকে সাহায্য করা – এই কাজে আনন্দ পাচ্ছে স্বাতী ।

– স্বাতী তুই এতদিন কোন চাকরী করলি না, বলতিস কোনদিন করবি না, এখন এই চাকরিই এত ভালো লাগছে তোর ?

– সুদীপ খুব জোর করছিল । বলেছি না ? কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জোর করেই ঠিক করেছে । ভীষণ ভালো লাগছে আমার । অবিশ্রান্ত কথা বলে চলে স্বাতী । ওর কোলিগ, ওর বস, এক খ্যাপা ক্রেতা, বোনাস, ওর রোজকার রুটিন । স্বাতীর প্রবল উচ্ছাসে সামিল হতে না পারার জন্য মনে মনে কুঁকড়ে যেতে থাকে কস্তুরী । ব্যাগের গায়ের আঙুল রাখে, তোলে, নামায় । অন্য হাতে কুঁচি ঠিক করে শাড়ির । লাইন কেটে যায় আচমকাই । আটলান্টিকের ওপারে স্বাতীর ট্রেন টানেলে ঢুকছে । কস্তুরী যখন ওদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, গাড়ি পার্ক করছে বাহাদুর, পূর্ণেন্দু ড্রয়িংরুমে টিভি দেখছে । কস্তুরী ড্রয়িং রুম পেরিয়ে শোবার ঘরে এল । তারপর কিচেনে ঢুকে ঠান্ডা খাবার বের করে রাখল । মাইক্রো ওয়েভে গরম করবে । বাহাদুর বাজারের ব্যাগ আর গাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল । ঘরে আলো জ্বালা ছিল । মাইক্রো ওয়েভে ঘূর্ণায়মান নৈশাহারের সুগন্ধ ভাসছিল । টিভির ভল্যুম লো অথবা মিউট করা ছিল । নৈঃশব্দের কি নিজস্ব গন্ধ কিম্বা আয়তন ? এই মাইক্রো ওয়েভের গোঁ গোঁ আওয়াজ, মুরগীর মাংসের গন্ধ এই সব উপাদানে গঠিত হচ্ছিল নৈঃশব্দের অবয়ব, এই সতেরোশো স্কোয়ার ফিটে । যেমন হয়ে থাকে । যেমন হয়ে এসেছে পঁচিশ বছর ।

অন্য কোথাও, পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে তখন ভোর হচ্ছিল । স্বাতীর উচ্ছাস তখনও ফুরোচ্ছিল না । সুদীপকে

অজস্র চুমু খাচ্ছিল ও । সুদীপের কপাল চন্দনের ফোঁটার মত ভরে যাচ্ছিল চুমুতে । ঠোঁট ভিজে যাচ্ছিল অবিশ্রান্ত । নরনারী মিলিত হবে এখন । স্বাতীর ধুসর চুলে আসুল বোলাচ্ছিল সুদীপ ।

– বেড়াতে যাবে ? অনেকদিন কোথাও যাইনি আমরা . . .

. . . সুদীপের ছোটবেলার শহর প্রথমে – উঁচু নিচু পথ, উপত্যকা, ছোটো টিলার ওপর কলেজ, জঙ্গল, ভাঙা রাজবাড়ি, না কাটা দাড়ি আর ডায়বেটিসে কিছু চেনা মানুষ, এখনও – পুরোনো ওষুধের দোকান, ধানক্ষেতের পাশে শ্মশান । তারপর বালি, কেল্লা, উট – ওদের মধুচন্দ্রিমার শহর । সেই সব গলি, এক পাশে বিশাল কড়াইতে দুধ উথলাচ্ছে – কেশর বাদামবাটা দুধ এ'গেলাস থেকে সে গেলাস আলম্ব নামছে – এ পাত্র থেকে সে পাত্র, সে পাত্র থেকে এ পাত্র, অন্য পাশে কড়াইতে তেল, বেসন, সুবৃহৎ লঙ্কাভাজা, বালির বুক চিরে মসৃণ কালো পিচ রাস্তা, স্যান্ডিউন, উটেদের সারি । প্রাচীন জলাশয়ের ধারে – আজও আকাশ ভরে পাখি উড়ছিল ইতস্ততঃ – আসন্ন সূর্যাস্তের কমলা আলোয় প্রাচীন ছত্রীর কালচে শিল্যুএট – তার পাশে আবৃতমুখ বৃদ্ধ – সাদা কাপড়ের শিরস্ত্রাণ । বাঁ হাতে যন্ত্র । ডান হাতে ছড় । ছড় চলেছে মসৃণ, সমান্তরাল . . . . কেশরুয়া বালমা । পাখি উড়ছে । উড়ে বসছে । সারিন্দায় বেজে চলছে কেশরুয়া বালমা ....

তখন মধ্যরাত । কস্তুরীর সেলফোনে স্বাতীর মেসেজ আসে – ও চলে গেল এই মাত্র । ম্যাসিভ অ্যাটাক । কিচ্ছু করতে পারলাম না ।

রেজিগনেশন দিয়েছিল স্বাতী । ভালো লাগছিল না আর । সময় কেটে যাচ্ছিল – এটা ঠিক । কাজু আর মিঠি বারণ করেছিল – ছেড়ো না বলেছিল । বলেছিল – বাবা খুশি হোতো না । আর সমস্তদিন একা একা কি করবে ? স্বাতীও জানে না কি করবে ও । একটা অ্যাড দেখছিল । কমিউনিটি কলেজে টাউন প্ল্যানিং পড়ানোর লোক খুঁজছে । অ্যাপ্লাই করবে ভাবছিল । বাড়িটা বিক্রি করে কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে স্বাতী । সেখানেই আছে ।

কিছুদিন যাবৎ একটা খেলা খেলত ওরা । সুদীপ আর ও । ওকে ভেবে নিতে হত সুদীপ নেই, সুদীপ ভাবত স্বাতী নেই । মৃতদেহ কল্পনা করে নিতে হত দুজনের । খেলতে খেলতে কেঁদেছে স্বাতী । পাগলের মত কেঁদেছে । প্রস্তুত ভেবেছিল নিজেকে । অথচ খেলাটা এতটুকুও হেল্প করছে না এখন ।

স্বাতী ভাবতে চেষ্টা করছিল অন্য ঘরে আছে সুদীপ । পাশের ঘরে । এ ঘরে আসছে না তাই দেখা হচ্ছে না । ভাবছিল হয়ত । কিম্বা সম্পূর্ণ শূণ্য ছিল ওর মন ।

জানলার কাঁচে ঘনীভূত জল হয়ে গড়িয়ে নামছিল । বাতাসে জলকণা ছিল পর্যাপ্ত । রান্নার উষ্ণ বাষ্প মিশেছিল তাতে । ছোট তোয়ালে দিয়ে জানলার কাঁচ মুছছিল স্বাতী । জলকণাগুলি একত্র হয়ে নেমে আসছিল, তোয়ালে শুষে নিচ্ছিল তা । জানলার বাইরে বড় গাছ, উল্টোদিকের বড় বাড়ি – স্বাতীর চোখে পড়ছিল আবার পড়ছিলও না । ওর হাত চলছিল যান্ত্রিক । মন কখনও সুদীপ, কখনও কস্তুরী কখনও উল্টোদিকের ব্যালকনির বাহারি গাছে ছিল । হাত নেমে আসছিল, চক্রাকারে ঘুরছিল । কাঁচ শুকিয়ে আসছিল দ্রুত । ভেজা তোয়ালে নিয়ে কিচেনে ঢুকল স্বাতী । ঈষৎ অন্যমনস্ক । স্রেফ ভাত আর ডাল রান্না করেছিল ও । ভাতের মাড় ভাতেই মরে গিয়েছিল । ডাল ফুটে উপচে পড়েছিল স্টোভটপে । এখন শুকিয়ে গেছে । ভেজা তোয়ালে দিয়ে আলতো ঘষল ও । তারপর ক্লিনিং সল্যুশন স্প্রে করল স্টোভটপে । কিছু আগে হটপ্লেট অন ছিল । তখনও গরম । রাসায়নিকের সামান্য কয়েক ফোঁটা অদ্ভুত এক বাসের জন্ম দিল । না ফেলা ট্র্যাশব্যাগের ঈষৎ টক গন্ধ, সারারাতের আটকে থাকা বাসি বাতাসের গন্ধ, সব ছাপিয়ে উঠল আশ্চর্য এক গন্ধ । কিসের গন্ধ জানে না স্বাতী । ওর বুক উথাল পাতাল হল আচমকা । দৌড়ে অন্যঘরে এল । এক টানে খুলল সুদীপের ওয়ার্ডরোব । সুদীপের শার্ট, টি শার্ট, ট্রাউজার্স, ব্লেজার । হ্যাঙ্গার থেকে খুলে নিল শার্ট । বের করে আনল আয়রনিং বোর্ড, আয়রন । ইস্ত্রি করতে লাগল সুদীপের শার্ট, নীল সাদা চৌখুপি, সবুজ পিন স্ট্রাইপ, বাটার ইয়েলো – উত্তাপে বেরিয়ে এলো ব্যবহৃত পারফিউমের অবশিষ্ট বাস । ঘোরে পাওয়া মানুষের মত ইস্ত্রি করে চলছিল স্বাতী । জোরে জোরে ঘষছিল সুদীপের বুক পকেট কলার, কাঁধ । ওর হাত ব্যথা করছিল । বাস উঠে আসছিল । পুরোনো সব বাস । ওকে বেষ্টন করছিল ।

সংকলন

আচমকা কলিং বেল বাজে এই সময় । স্বাতী চমকে উঠে দরজার কাছে যায় । কিহোলে চোখ রাখে । দরজা খোলে । পুলিশ অফিসারটি বয়সে তরুণ । কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে আই ডি কার্ডটি স্বাতীকে দেখিয়ে পকেটে রাখে ।

– ইভ্যাকুয়েট করতে হবে ম্যাডাম । ইমিডিএটলি । যে অবস্থায় আছেন । আপনার ওপরের অ্যাপার্টমেন্টে একসপ্লোসিভ পাওয়া গেছে । বম্ব ডিসপোসাল আসছে । ওরা গ্রীন সিগনাল দিলে তবে ফেরত আসতে পারবেন । বাট এভ্যাকুয়েট, নাউ । ইমিডিয়েটলি । স্বাতী ইস্ত্রি আনপ্লাগ করে, গায়ে চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসে ।

বাইরে ততক্ষণে বেশ লোক । পুলিশ অফিসারটি, দু-তিনজন চাইনিজ তরুনী – ইউনিভার্সিটির ছাত্রী – স্বাতী দেখেছে আগে – সিঁড়িতে, লবিতে । এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়স্ক মানুষ কজন । একজনের মাথায় বেসবল ক্যাপ, কানে মোবাইল, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন । মুখ চেনা একজন, বাকি দুজনকে দেখেনি স্বাতী । অফিসারটি স্বাতীর কাছে এসে খাতা খোলে । ওর নাম, মোবাইল নম্বর লিখে নেয় । স্বাতী কিছুটা অগোছালো ঘুরতে থাকে কমপ্লেক্সে । বেসবল ক্যাপ এবারে মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে আসেন ।

– আপনাদের খুব অসুবিধে করলাম । এক্সট্রেমলি সরি । আপনার ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটা আমার মা-র । জানেন তো ?

– ঠিক জানি না । আমি খুব বেশিদিন আসিনি এই অ্যাপার্টমেন্টে । তবে দেখছি মাঝে মাঝে ব্যালকনির টবে জল দিচ্ছেন এক বৃদ্ধা । তিনি-ই তবে আপনার মা ।

– মা গত সপ্তাহে আমার কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেই থেকে নার্সিং হোমে । আমি আজ এসেছিলাম অ্যাপার্টমেন্ট ভ্যাকুয়াম করতে, গাছে জল দিতে । অগোছালো হয়ে আছে সব । পুরোনো একটা বাক্স ছিল । আমার বাবার । আজ এসে দেখি সেইটা সামনের ঘরে । খুললাম । পুরোনো ফোটো । পুরোনো চিঠির তাড়া আর তার তলায় চার চারটে গ্রেনেড । ভাবুন একবার । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে আর এমারজেন্সি কল করলাম । তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন । এক্সট্রিমলি সরি । থ্যান্ক গড যে বৃষ্টি ফৃষ্টি হচ্ছে না ।

– আপনার বাবা কি আর্মিতে ছিলেন ? হয়তো মেমেন্টো রেখে দিতে চেয়েছিলেন ।

– হ্যাঁ বাবা আর্মিতে ছিলেন । ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ভেটেরান । মেমেন্টোই বটে । বাবা, মা কিচ্ছু ফেলতেন না । সব আছে, জানেন ? আমার ছোটো বোনের খেলনা, পুতুল এমনকি ঝুমঝুমিটাও । আমার বেসবল ব্যাট, সাইকেলের পাম্প । উফ । এখন কি ঝামেলা হ'ল বলুন তো । আপনাদের কাছে কি বলে ক্ষমা চাইবো . . .

– আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু ।

বলছেন ? পুলিশের ঝামেলাটা মিটে যাক, একটু ওপরে আসবেন । মা-র কফির শখ ছিল । ভালো কফি আছে । মরোক্কোর । কফি খেয়ে যাবেন প্লীজ ।

আমি পিটার ।

– আমি স্বাতী । এস ডাবলিউ এ টি আই ।

বম্ব ডিজপোজালের লোক আসে । ফায়ার ব্রিগেড । সাইরেন । পুলিশের গাড়ি । ভীড় বাড়ে । স্বাতী একলা দাঁড়িয়ে থাকে । কিছুক্ষণ আগের সেই সব গন্ধ ওকে ছেড়ে গেছে ততক্ষণে । বেবাক ফাঁকা মাথা । ফাঁকা মন । বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে ও । এভাবে বেলা বাড়ে । ভীড় হাল্কা হয় । হলুদ বেষ্টনী তুলে নেওয়া হয় । অফিসারটি গলা তুলে বলে ওঠেন – বিল্ডিং সম্পূর্ণ নিরাপদ । আপনারা ভেতরে ঢুকতে পারেন । একসপ্লোসিভগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । স্বাতী গায়ের চাদরটা গুছিয়ে নেয় । অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে । আয়রনিং বোর্ড, বোর্ডের ওপর সুদীপের শার্ট, ইস্ত্রিটা । স্বাতী বাথরুমে ঢোকে দ্রুত । আবার বেল বাজে । পিটার ।

– ফ্রী আছেন ? আসুন একটু, কফি খেয়ে যাবেন ।

ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটির বিন্যাস স্বাতীর আস্তানার মতই । শুধু সর্বাঙ্গে প্রাচীন ছাপ । দেওয়ালে রং ওঠা ওয়াল পেপার, ছত্রাকের কালচে ছোপ, বিবর্ণ কার্পেট – রোঁয়া ওঠা । অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ । পুরোনো বইয়ের । পুরোনো কাগজের । সোফার ওপর কার্ড বোর্ডের বাক্স । বাক্স ভরা গ্রামোফোনের প্রাচীন চাকতি । সেভেন্টি এইট, ফর্টি ফাইভ, থার্টি থ্রী আর পি এম । পুরোনো সব গান । ডাঁই করা বই । স্বাতী বই ঘাঁটে । কিচেনে কফি বানায় পিটার আর অবিশ্রান্ত বকে যায় । শিরদাঁড়াভাঙা জীর্ণ বই পোকায় কাটা, হলদে দাগ । স্বাতী ঘাঁটে, রেকর্ড ঘাঁটে । বইটি হাতে উঠে আসে

এই সময় । হার্ডবাউন্ড বই ছিল, এখন মলাট থেকে খুলে এসেছে ।

– শোনো পিটার, এই যে বইটা – লেটার্স অফ অ্যান ইন্ডিয়ান জাজ টু অ্যান ইংলিশ জেনটল উওম্যান । পড়েছ ?

– নাঃ ।

– পাবলিশারের নোটে কি লেখা আছে শুনবে ? লেখা আছে, These letters were not written with a view to publication. They are now printed with the author's permission, but for obvious reasons no name appears on the title page.

পিটার, বইটা নিতে পারি ?

– অফ কোর্স । ইন্টারেস্টিং লাগলো ?

– খুব ।

– শুধুই পাবলিশারের নোট পড়লে তো !

– পিটার, দিস বুক ইজ পাবলিশড উইদাউট আ প্রিফেস ।

– রিয়েলি ! কেন ?

– বলছে, since it seemed best to allow the letters to speak for themselves.

মেইল চেক করছিল কস্তুরী । রবিবার । পুর্ণেন্দু যথারীতি ড্রয়িং রুমে । টিভি চলছে । কিচেনে ঢুকে আভেনে প্যাটিস গরম করতে দিল কস্তুরী ।

– অনুপম আসবে বলেছিল । এল না তো ।

– আসবে । বলেছে যখন আসবে ।

– শীতের বেলা, এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে ।

পূর্ণেন্দু টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিল এই সময় । পা তুলে দিল কফি টেবিলে ।

অনুপম হন্তদন্ত হয়ে এল বেশ কিছু পরে । হই হই করে বলল,

– প্যাটিস পরে হবে । হেব্বি শীত । চলুন ব্যাডমিন্টন খেলে আসি একহাত । বৌদি, সোনাই রূপাই-এর র‍্যাকেটদুটো আছে ? পিন্টুদা, পাজামা ছাড়ো তো । প্যান্ট পরো । অন্ধকার হওয়ার আগে খেলে নিই চলো । ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সের কোর্টে তখন শীতের বিকেল । আলো মরে আসছে দ্রুত । একপাশে শীর্ণ জবাগাছ । শুকনো ভঙ্গুর পাতা । কোমরে আঁচল গুঁজল কস্তুরী । ওদিকে অনুপম । শাটল কক উড়ছে । এদিক থেকে ওদিক । ওদিক থেকে এদিক ।

হাল্কাচালে খেলা । কস্তুরী কোমরে হাত দিয়ে দম নিল সামান্য । অনুপমও ।

– পিন্টুদা, দাঁড়িয়ে দেখলে হবে ?

– আর তো র‍্যাকেট নেই ।

– আমার টা নাও । আমি একটু ইয়ে ফুঁকে আসি ।

কস্তুরীকে আশ্চর্য করে পুর্ণেন্দু হাতে র‍্যাকেট নেয় । এক পা পিছনে নিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে সার্ভ করে । এলোমেলো সার্ভ । শাটল মাটিতে পড়ে । কস্তুরী শাটল তোলে, আলতো আঙুল বোলায় । তর্জনীর নখের পাশের শুকনো চামড়ায় সাদা দাগ পড়ে । সার্ভ করে কস্তুরী । চাবুক চালানো স্ম্যাশ করে পূর্ণেন্দু । সপাটে ফেরত পাঠায় কস্তুরী । এক পা পিছিয়ে বাতাসে র‍্যাকেট চালায় পূর্ণেন্দু । কক উড়ে আসে তৎক্ষণাৎ । কস্তুরী তুলে দেয় আলতো । পূর্ণেন্দু আবার স্ম্যাশ করে । কস্তুরী ফেরত পাঠায় । পূর্ণেন্দু ওকে ছুটিয়ে বেড়ায় । নিজেও ছোটে । মাটিতে পড়ে না শাটল । পূর্ণেন্দু কোর্টে দাপিয়ে বেড়ায় । খ্যাপার মত দেখায় ওকে । শাটল কক শুকনো ঠান্ডা হাওয়া কেটে সাই সাই উড়তে থাকে । মাটি পায় না । কস্তুরীর বিনবিনে ঘাম শুরু হয় । বাঁ হাঁটু কমজোরি ঠেকে । অনুপম ফিরে আসে এই সময় ।

– পিন্টুদা ঢিলে দাও, বৌদির টায়ার্ড লাগছে বোধ হয় ।

পূর্ণেন্দুর র‍্যাকেট শাটল ছোঁয়ার শব্দ । তারপর বাতাস কাটার আওয়াজ ওঠে । সাদা পালক কটি একত্রিত – ভেসে আসতে থাকে কস্তুরীর দিকে । কস্তুরী চোখ সরায় না । ধূসর আকাশ, পাক খাওয়া কালচে মশার ঝাঁক পেরিয়ে আসতে থাকে শাটল কক, নিষ্পত্র বৃক্ষশাখের ব্যাকগ্রাউন্ডে শুভ্র পালকগুচ্ছ । সে মুহূর্তে পূর্ণেন্দুর মুখ দেখতে বড় সাধ হয়

কস্তুরীর । সে চোখ সরায় । শাটল কক র‍্যাকেট না ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে ফলতঃ । পূর্ণেন্দু র‍্যাকেট ছুঁড়ে দেয় শূণ্যে ।

– ভাল্লাগছে না । ভেতরে চল্ ।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে কস্তুরী দেখে – বাইরের ঘরে টিভি চলছে তখনও – অন্ধকার ঘরে টিভির নীল আলো শুধু – টিভি চলছে – আলো কখনও কম কখনও বেশি – পূর্ণেন্দু পাজামা নামিয়ে দু-উরুর মাঝে হাত ঢুকিয়ে গোঙাচ্ছে । কস্তুরী লুকিয়ে ফিরে আসে । বালিশে মুখ ঢুকিয়ে হা হা কাঁদে । মৃত্যু কামনা করে । পূর্ণেন্দুর । অথবা নিজের । ঠিক সেই সময়ে আটলান্টিকের ওপারে প্রাচীন বইটি খুলছে স্বাতী । বাতাস বইছিল না । নিষ্পত্র বৃক্ষরাজি, জনবিহীন সাইডওয়াক, একলা স্ট্রীটলাইট যেন কিছুর প্রতীক্ষায় ছিল । আকাশ ঘোলাটে । স্বাতীর দুহাতের মধ্যে প্রাচীন বই । শিরদাঁড়া ভাঙা । মলিন পাতা, ছত্রাকজন্মের কালচে ছোপ । একগুচ্ছ চিঠি । কবে খুব ভিজেছিল যেন । বিবর্ণমলাটদ্বয় যেন এতদিন তার জন্যেই আগলে রেখেছিল এই সব চিঠি । যেন ওর পাতা ওল্টানো শেষ হলেই ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে সব ।

‘You must excuse a letter from somebody you may this morning not even remember. It is the lonely young man with the black face beside the door - to whom you were so kind last night.’

নিচে সই – অরবিন্দ নেহেরা । চিঠি এক । একলা মানুষের নির্জন কখন শুরু হয়ে যায় । প্রথমে একটি তুলোটে আঁশ স্বাতীকে ছোঁয় যেন । আলতো । ফ্যাকাশে । ক্রমশঃ অজস্র কথা, অবিশ্রান্ত কথা গাঢ় । ঘন হয়ে স্বাতীকে ছুঁয়ে থাকে অঝোরে এবং তুমুল । সাদাটে তুলোর আঁশে ঢেকে যেতে থাকে সে । চিঠি দুই, চিঠি তিন, চিঠি চার চিঠি দশ ....

‘Please, if ever you have any time to spare, will you remember again the lonely young man beside the door ...?’ স্বাতী পড়ে – অখন্ড মনোযোগে পড়ে চলে । এলোমেলো বাতাস বয় । প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন সময় ওড়ে – স্বাতীর দুহাতে মাঝখানে এসে থামে । ‘It is only the hand that holds friendship which in time one does not need to shake away’। একলা মানুষের দৈনন্দিন জানছেন এক অসম্পর্কিত শ্বেতাঙ্গিনী – অরবিন্দ নেহরার লেডি সাহিব । তারিখবিহীন চিঠি সব । বিচিত্র । আচ্ছন্নকারী । প্রাচীন সময়, প্রাচীন রীতি-রাজনীতি – বর্ণবিদ্বেষ – সন্তানের অকালমৃত্যু – গান্ধী – অসহযোগ, গো ব্যাক সাইমন – স্ত্রী সর্বক্ষণ পুজোর ঘরে । ‘So then, I came home, and here I am, reading over your last kind letter, and trying to forget my anxiety by writing to you . . .’ স্বাতীর দুহাতের মাঝে এখন বার্মা মুলুক, শিলং পাহাড়, কলকাতা, মালাবার হিলস । এলোমেলো উড়ছে অজস্র তুলোর আঁশ । ঝরে পড়ছে । চিঠি কুড়ি তিরিশ, চল্লিশ সাদা তুলোর আঁশে ভরে যাচ্ছে ওর ঘরদোর, খাটবিছানা, কিচেন, স্টোভটপ, ওর আয়রনিং বোর্ড, কাঁচের জানালা, পাশের বাড়ির বাহারি গাছ । স্ট্রীটওয়াক, ল্যাম্পপোস্ট সাদা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ ।

‘Like the threads that go to make the pattern in a carpet, we are all mixed up with one another, black men, white men, yellow men. ... I like to think that through my pattern there runs a small golden thread, that makes it really quite smart, and that is your kindness to me, and your understanding, and your understanding, and our friendship and all that it has meant.’

আকাশ বলে আর কিছু নেই তখন । ঘন কুয়াশার মত তুলোর আঁশ সবখানে । চিঠি পঁয়তাল্লিশ, চিঠি পঞ্চাশ . . . . ‘There is no one in my own small world to one I can talk of it with any certainty of being understood ...’ বালিঘড়িতে সময় ঝরছিল – স্যান্ড ডিউন বেয়ে উটের সারি যাচ্ছিল কোথাও – সারিন্দায় ছড়ের চলন শুনছিল স্বাতী – ‘The shadows fall, Lady Sahib. The shadows fall. I must wait until I hear upon the stairs the feet of one come to light my lamp ...’

সংকলন

– কতদিন কথা বলি নি সুদীপ, কত দিন . . . .

প্রাচীন ধুলো, মৃত মথ, ঝুরো পাতা ওর কোলে । কাগজকলম নিল ও ।

সুদীপ,

আজ এই শীতের প্রথম বরফ পড়ল । চারদিক একদম সাদা . . . .

স্বাতীর ফোনটা যখন এল, কস্তুরীর তখন সকাল হয়েছে । সূর্য উঠছিল ওর বাঁদিকে । ওর ডানদিক থেকে একটা প্লেন উড়ান দিয়েছিল । মাথার ওপর প্লেন আর সামনে সূর্য নিয়ে ও হাঁটছিল । বাঁ হাঁটু খচ খচ করছিল সামান্য । তবু ও হাঁটছিল । যেন ওকে হেঁটে যেতেই হবে । যেন ওর হাঁটা ছাড়া গতি নেই । সেই সময় ফোন বাজতেই একটু দাঁড়িয়ে পড়ল ও । কথা শুরু করল কস্তুরীই ।

– কিরে তুই এই সময় ? কাল তোকে ফোন করলাম । বেজে গেল । মেইল-ও নেই ।

– কলেজে বেশ অনেকটা সময় দিচ্ছি আজকাল । ফিরেছি, দেরিতে, টায়ার্ড লাগছিল । না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । পরে দেখি তোর ফোন এসেছিল । যখন দেখলাম, তুই তখন ঘুমাচ্ছিস ।

– কেমন লাগছে পড়াতে ? এতদিন পরে ?

বহুদিন পরে অসম্ভব উচ্ছ্বসিত হল স্বাতী ।

– ভীষণ ভালো লাগছে রে । ভীষণ ভালো । চ্যালেঞ্জিং । বাড়ি ফিরে রোজ ওকেও তাই লিখছি । স্টুডেন্টদের কথা কোলিগদের গল্প । আজ এই হল, ঐ হল ।

– রোজ লিখিস তুই সুদীপকে ?

– প্রতিদিন । একটা করে চিঠি । লম্বা চিঠি । সব লিখি তাতে । সব । সারাদিন কাজের মধ্যেই ভেবে যাই আজ এই লিখব । এই কথা লিখতে হবে । ঐ কথাটা বলা হয়নি । আজকাল মনে হয়, ওকে লেখার জন্যেই এত কাজ করি । সত্যি ।

– কি করিস চিঠিগুলিকে ?

– ফাইলে রেখে দিচ্ছি । থাক । কোনদিন এই এপার্টমেন্ট খালি করতে এলে কাজুরা পাবে ।

– এবছরে আসার দিন ঠিক করলি কিছু ? কবে আসছিস ? কাল এই কথাটাই জানতে ফোন করেছিলাম ।

– ঐ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি । যেমন আসি । এবারে কেটে নেব টিকিট । তুই পেলি বইটা ?

– না, দোকানে পেলাম না । ক্রস ওয়ার্ডে খুঁজলাম । অক্সফোর্ডেও । ইন্টারনেটে অর্ডার করে দেব । কাল ইন্টারনেটে বইটা নিয়ে অনেক কিছু পড়ে ফেল্লাম । চিঠিগুলো সত্যিকারের নয় বোধ হয় ।

– জানি । . . . . এই কস্তুরী, শোন, এখন রাখি । কে যেন বেল বাজাচ্ছে ।

কি হোলে চোখ রেখে দেখে পিটার ।

– কেমন আছ দেখতে এলাম ।

– পিটার ! এসেছ তোমরা টের পেয়েছি । মাথার ওপর খুটুর খাটুর । তোমার মা কেমন আছেন ?

– এখন কিছুদিন রিহ্যাব সেন্টারে থাকতে হবে । তারপর ওল্ড এজে হোমে থাকবেন । অ্যাপার্টমেন্টটা বিক্রি করে দেব । জিনিসপত্র গোছগাছ করছি । পুরোনো বেশ কিছু ফার্নিচার তো ফেলেও দিলাম আজ ফুটপাথে । কাল কাউন্সিলের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে । এখনও গোছাচ্ছি । কোনটা ফেলে দেব, কোনটা থাকবে । তারপর রং করিয়ে বিক্রি করে দেব । কি বলব তোমাকে কি যে জমিয়েছে আর কি যে জমায়নি বুড়ি . . . আজও কত কি বের করলাম । এক কাজ করো না ডিনারে এসো ওপরে । সব দেখাবো । অনেক রেকর্ড পেয়েছি । চিঠি বই । দেখাবো তোমাকে । মরিয়াও আছে । কাল তো শনিবার । তুমি সাতটায় চলে এস ।

দরজা বন্ধ করে ঘড়ি দেখে স্বাতী । বেশি সময় নেই । কি ভেবে ভ্যাকুয়াম করে ঘর । আবার ঘড়ি দেখে । কস্তুরীর নম্বর ডায়াল করে ।

– এই তখন ছেড়ে দিতে হল, পিটার এসেছিল ।

– কি বলছে ?

সংকলন

– ডিনারে ডাকল । আরো অনেক পুরোনো জিনিস পেয়েছে, দেখাবে ।

– দারুণ তো । ঘুরে আয় । দ্যাখ, ইন্টারেস্টিং কিছু পাস যদি । হয়তো পুরোনো চিঠি পেলি এক গোছা আর দেখলি পিটারের ঠাকুমাই আসলে অরবিন্দ নেহরার সেই মেমসাহেব । হতেও তো পারে ।

– গল্পে এমন হয় ।

– আর বাস্তবে ?

– ভাব্ তুই । আপাতত বাস্তব হল আমাকে একটু বেরোতে হবে – ফুল আর ওয়াইন নিয়ে আসি চট করে তারপর ওপরে যাব ।

– এখন বেরোবি ? ওয়েদার কেমন ? বৃষ্টি পড়ছে ? অবশ্য গাড়ি নিয়েই তো যাবি ।

– না গাড়ি নেব না । একটু প্রবলেম করছে, সার্ভিসিং করাতে হবে । হেঁটেই যাব । এই তো দশ মিনিট ।

– হাঁটবি ? বলছিলি যে তোর হাঁটুও আমার মতই ঝামেলা করছে ।

– সে রকম কিছু না । রাখি এখন ? রাতে মেইল করব ।

স্টেশনের পাশে ছোটো দোকান – চিনে দম্পতির । সেখান থেকে ফুল নিল স্বাতী । সে দোকানের একপাশে বুচার, অন্যপাশে ওয়াইন শপ তখনও শপ খোলা ছিল । রেড ওয়াইন নিল স্বাতী । একহাতে ফুল, অন্য হাতে কাগজে মোড়া ওয়াইনের বোতল । প্রায় নিঝুম পাড়া । গৃহস্থের আঙিনায়, সিঁড়িতে মৃদু আলো । কুকুর ডাকছিল । বাঁদিকের দোতলা বাড়ির দোতলায় ঝমঝম পিয়ানো বাজছিল । এমন সময়ে জোরে বৃষ্টি এল । ভিজছিল স্বাতী । চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেল । ওর একহাতে ফুল, অন্য হাতে ওয়াইন । এই রাউন্ড অ্যাবাউটটা পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা পেরোলেই ওর অ্যাপার্টমেন্ট । অ্যাপার্টমেন্টের আলো দেখা যাচ্ছিল । ফুটপাথে ডাঁই করা বাক্স, পুরোনো টেলিভিশন, রেডিও, আয়না । কাল কাউন্সিলের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে । বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল সব । এক দৌড়ে পৌঁছে যেতে চাইল স্বাতী । ওর হাঁটু অবশ হয়ে এল এই সময় আচমকা । স্টীল গ্রে ফোর্ডের ঈষৎ মাতাল ড্রাইভার যখন টার্ণ নিচ্ছিল প্রচন্ড জোরে, সে দেখতে পেল লংকোট, শাড়ি, একহাতে ফুল, হাঁটুমুড়ে বসে পড়ছে রাস্তায় । থামতে চাইল সে । ফোর্ডের চাকা স্কিড করল ভেজা অ্যাসফল্টে ।

ড্রয়িং রুমে টিভি চলছিল যথারীতি । মাইক্রো ওয়েভে রাতের খাবার গরম হচ্ছিল । দেওয়াল জুড়ে প্রাচীন সব ছায়া । নৈঃশব্দের অবয়ব স্পষ্ট ।।

কস্তুরী চিঠি লিখছিল ।

স্বাতী,

এখানে গরম পড়ে গেছে, জানিস ?

বইটা অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজনে । এসে গেছে । ডিটেইলে লিখব । আজ হবে না । অনুপম আসবে এখনই । তোকে অনেক কিছু বলার আছে . . . .

সবুজ ফাইলটা পাশেই রাখা ছিল । ফাইল খুলল ও । দড়ি বাঁধা পুরোনো সবুজ ফাইল । সবুজ ওর প্রিয় রং । চিঠিটা ফাইলে ঢুকিয়ে আলতো গিঁট দিল কস্তুরী ।

স্মৃতি

বানী ভট্টাচার্য্য

রেডিওতে প্রতিমা যখন শুনলো আবার একটা ছেলে বাবামা দুজনকেই হত্যা করেছে, তখন প্রতিমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। প্রতিমার ফেলে আসা জীবনের দিনগুলির অনেকগুলো কথাই আজ খুবই মনে হলো, বিশেষ করে যখন ছেলেরা ছোট ছিল, তাদের কথাই। মনে মনে ভাবে সে সেই মধুর দিনগুলোর কথা। তখন কিন্তু প্রতিমার কাছে দিনগুলো ছিল খুবই কঠোর। নানা কাজকর্ম্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকতো প্রতিমা, কিন্তু সময় পেলেই লোকেদের সাথে আর বন্ধুদের সাথে একসঙ্গে হতো যখন কথার বেশীর ভাগই থাকতো প্রতিমার ছেলেমেয়েদেরই নিয়ে।

বেশ অনেক বছর আগে প্রতিমার ছেলেরা যখন ছোট ছিল, হঠাৎ একদিন প্রতিমার কাজেরই এক বন্ধু, অমিতা বলেছিল, 'জানো, আমার পাঁচ বছরের ছেলের দুরন্ততার জন্যে আজ আমি পুলিশের কাছ থেকে একটা টিকিট পেয়ে গেলাম। প্রতিমা অবাক হয়ে বলেছিলো 'তুমি পুলিশের কাছ থেকে টিকিট পেয়েছো, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা তোমারই দোষের জন্যে। তুমি আবার ছেলের দোষ দিচ্ছো কেন ?' অমিতা বলেছিল, 'আগে সব ব্যাপারটা ধৈর্য ধরে শোনো তারপর মতামত দিস্।' বড়দিনের সময় যেমন লোকেরা ঘন্টা বাজিয়ে থালা রেখে সালভেশান আর্মির জন্যে টাকাপয়সা জোগাড় করে, সে রকম একজন লোককে ফুটপাতের কাছে দেখে গাড়িটা থামিয়ে একটুক্ষণের জন্যে তাড়াতাড়ি করে পয়সাটা দানসংগ্রহণের বাস্কতে ফেলতে গিয়েছি, ইতিমধ্যে আমার পাকা ছেলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই আমার কাছে ছুটে আসতে গেছে, এক পুলিশ তার হাত ধরে এনে আমার কাছে দিয়ে, তারসঙ্গে আমাকে একটা একশো টাকার টিকিট লিখেই শুধু ছাড়লো না, তারপরেও আমার ওপর এক বিরাট উপদেশ ছাড়লো, উনি নাকি দয়া করে আমাকে খুব লঘু দন্ড দিলেন, এরকম সাংঘাতিক কাজ করা আমার নাকি একেবারেই উচিৎ হয়নি। বুঝতেই পারছো আমার ভাল কাজের এই হলো পরিনাম।'

অমিতার কথার পরে চৌখস প্রতিমা কিন্তু সেদিন চুপ করে থাকেনি। কিছুতেই হারবে না প্রতিমা কারুর কাছেই আর কোনো ব্যাপারেই নয়। কাজেই তারও কিছু যোগ করা

চাই। কিন্তু কি বলবে সে ছেলেদের সম্বন্ধে। মিথ্যে কথাও বলতে পারে না প্রতিমা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রতিমার অতীতের একটা ঘটনা। তাই তখনই বলে উঠেছিল প্রতিমা, 'আমার ছেলেরাই কি দুরন্ততে কম যায় নাকি ! জানিস্ বিকেলে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই সন্ধ্যের সময় ডিনার মিটিংএ যেতে হয়। রাত্রির বেলা বলে, আমরা একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক বেবীসিটার জিনিকে ঠিক করেছিলাম। আমার ছেলের কিন্তু তাঁকে একেবারেই পছন্দ নয়, কারণ, তিনি নাকি আমার সাড়ে চার বছরের ছেলের সঙ্গে ঝাপাঝাপি করতে পারেন না বেসমেন্টে বল খেলতেও পারবেনা আমার ছেলে আকাশের সাথে। আমি ছেলের কথায় কান না দিয়ে তার কাছে আকাশকে রেখে একদিন বিকেলে বেরিয়ে ছিলাম। কেন জানি না, আমাদের সেদিন একটু তাড়াতাড়িই আটটা নাগাদ মিটিংটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম। গ্যারাজ খোলার শব্দ পাওয়া মাত্র ছেলে ছুটে এসেছিলো, কে এলো দেখতে কারণ আমি আকাশকে খুব করে বুঝিয়ে বলে গিয়েছিলাম আমার ফিরতে রাত হবে, তাই ও ভাবতেই পারেনি আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। ছেলেকে জিজ্ঞেস করা মাত্র জিনি কোথায়, আকাশ আঙুল তুলে ইঙ্গিতে বোঝালো জিনি ওপরে। আমি একটু অবাক হলাম। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম 'ওপরে কি করছে জিনি।' আকাশ বললো, 'বাথরুমে।' ছেলের সঙ্গে

একটু কথা বলার পর মনে হলো আমার, এখনো তো জিনিকে দেখছি না। আমি ওপরে গিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে দেখি বাথরুমের দরজাটা বন্ধ আর দরজার ওদিক থেকে দুমদাম আওয়াজ আসছে আর তারসঙ্গে জিনির ভাষা ভাষা গলা, 'দরজাটা খুলে দে সোনা, তোকে বিছানাতে শুতে যেতে হবে না। আমি দেখি আমার পেছনে পেছনে ছেলেও ওপরে উঠে এসেছে। ছেলে বললো, 'দেখেছো, জিনি আন্টি সেপ্‌টিপিন দিয়ে তোমার মতো কি করে দরজা খুলতে হয় তাও জানে না। নাদিয়া তো জানে।' নাদিয়া হচ্ছে একজন ইয়াং মেয়ে, যে হচ্ছে আমার ছেলের দুপুরের রেগুলার বেবীসিটার। আমার ছেলের, বন্ধ বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে কি করে খোলা যায় সেটা ভালো করেই জানা ছিল। কারণ আকাশ ছোট থাকতেই বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা যাতে না যায়, তাই দরজার লকটা ডিসেএবেল করে রেখেছিলাম। কিন্তু যদি বাইরের কেউ না জেনে দরজাটা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে, তাহলে ভেতরের লোককে দরজার লকের গর্ত্তর মধ্যে সেপটিপিন ঢুকিয়ে দরজাটা খুলতে হয়, সেটা ছেলে আমাকে করতে দেখেছে একদিন, যখন অতীতে আমি ছেলেকে নিয়ে বাথরুমের ভেতরে ছিলাম আর আমার স্বামী না জেনে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল না ভেবেই। আমি তাড়াতাড়ি করে দরজাটা খুলে দিতে যাচ্ছি যাতে জিনি বেরতে পারে, ছেলে আমাকে আবার বললো, 'জিনি আন্টিকে টাইম আউট করেছি কারণ আমাকে নটা বাজার আগেই শুতে যেতে বলেছে। আজকে শুক্রবার, আমার নটা পর্যন্ত জেগে থাকার কথা জিনি আন্টি সেটাও শুনতে চায় না আমার কাছ থেকে।' আমি তো এ সব কথা শোনার পরে আমারই নিজের ছেলেকে নিয়ে কি করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি আমার স্বামীর দিকে তাকাতেই আমার স্বামী বলে উঠলেন, 'বলেছিলাম না, দরজার লকটা একেবারেই দুদিক থেকেই ডিসএবেল করে রাখতে, যেমন শোনোনি আমার কথা এখন ভোগো।' আমি আমার স্বামীর দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে ছেলেকে বললাম 'তোমার সাথে কথা আছে' বলে তাড়াতাড়ি করে দরজাটা খুলে জিনিকে বললাম 'আমি খুবই সরি।' জিনি বললো 'ভাগ্যিস্ তুমি ফিরে এসেছো তাড়াতাড়ি করে। আমি আমার জন্যে ভাবছিলাম না। আমার ভাবনা হচ্ছিল একলা থাকাতে তোমার ছেলে আবার কি দুষ্টুমি করে বসে।' আমি অনেক এপোলজি চেয়ে আর বেশী টাকা দিয়ে অবশেষে জিনিকে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়াতে জিনি খুশী মনেই 'আমাকে আবার ডেকো' বলে প্রস্থান করেছিল। এত বড়ো কাহিনীটা বর্ণনা করার পর সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিমা অমিতার মুখের দিকে সরাসরি তাকালো।

অমিতা বলে উঠলো 'মা হওয়া কি মুখের কথা?'

প্রতিমা মনে মনে ছেলেকে খারাপ করার কমপিটিশানে ও জিতে গেছে মনে করে নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলো 'আমার কাছে সেটা এক্কেবারে ধ্রুব সত্যিরে, অমিতা।'

Chicago, IL

যাবে তুমি ?

মহম্মদ শাহরিয়ার

আমাকে বিষন্ন দেখে বিষন্ন হও যদি তুমি
মেয়ে বড় কষ্ট পাবে।
আমি যদি গাছ হই, পাখি হ'লে তুমি,
কোনো এক বসন্তের ঘোরে বাসা যদি বেঁধে ফেল
আমার শাখায়; রহিবে কি সেথা চিরদিন ?
ফিরে আসা বসন্ত ফিরে পায় কখনো কি
গেল বছরের পাখি আগের শাখায় ?

যদি হেঁটে যাই আমি দূর থেকে দূরে
তারপর আরো দূরে, খুব অজানায় . . .
হাঁটিবে কি তবু তুমি আমার পাশে ?
রবে কি তখনও তুমি আমার ছায়ায় ?
খুব দূরে হেঁটে যাওয়া খুব সোজা, যদি হাঁট
ভারহীন; মুক্ত স্বাধীন।

Chicago, IL

ওঁ থেকে ও-মারিয়া

সুভাশীষ মুখার্জী

আমাদের আধুনিক দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গীত (''Music'') ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে গেছে - Thanks to the digital and mobile technology । ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে এখন একটি সাদা (বা কালো) তার দিয়ে তাদেরকে 'জড়িয়ে' রাখে, যার দ্বারা ২৪ ঘন্টা, তাদের কর্ণ পথে, সঙ্গীত প্রবাহ অভ্যাহত । কিন্তু এই সঙ্গীতের, বিশেষ ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের, উৎপত্তি হলো কেমন করে ? কেনই বা তার সৃষ্টি হলো আর কি ভাবে তার বিবর্তন ঘটল, সেটা কিন্তু ওই mobile digital technology evolution-এর থেকেও interesting । তার প্রধান একটা কারণ হলো ভারতীয় সংগীতের দীর্ঘ ইতিহাস — প্রায় ৩৫০০ বছর । আরো একটা কারণ হলো সেই ইতিহাসে আছে নানা রকমের উত্থান, পতন, মিশ্রণ এবং ভাঙ্গন । আছে নানাবিধ প্রসঙ্গ — আধ্যাত্মিক থেকে বিনোদন । এবং সর্বপরি আছে এক অভূতপূর্ব গভীরতা যার মধ্যে অনুভব করা যায় একাধারে নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক এবং নানাবিধ ভাবের মূর্ছনা । সেই সংগীতের যাত্রাকে নিয়েই আমার এই প্রবন্ধ ।

সঙ্গীত — ঈশ্বরের উপাসনা

শুরু করা যাক একদম 'শুরুতে' । ''সিন্ধু সভ্যতার'' সময় থেকে, আন্দাজ ২৫০০-১৫০০ BC । সেই সময়ে যে সঙ্গীত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানা বিধ যন্ত্র (arched or bow-shaped harp, several varieties of drums) এবং মূর্তির মাধ্যমে । আজ সেই সংগীতের না আছে কোনো ছাপ আর না আছে তার কোনো documentation । সময়ের অতলে লুপ্ত হয়ে গেছে সেই সঙ্গীত বৈদিক যুগের আগেই ।

তারপর বৈদিক যুগের সূত্রপাত ১৫০০ BC । শুরু হলো ভারতীয় সংগীতের কাঠামো গঠন । আমরা সবাই জানি যে সংগীতের কাঠামোর মূলে ৩টি উপাদান — কথা, সুর এবং তাল । আবার সুরের রচনা হয় সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি কোমল অথবা তীব্র স্বর ব্যবহার করে । ঋক বেদের স্তবগানে সৃষ্টি হল প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত । তবে উল্লেখযোগ্য হলো সেই স্বরগান রচিত হত শুধু মাত্র একটি স্বর দ্বারা কারণ তখন আর ৬টি স্বরের আবিষ্কার হয় নি । তাই স্তবগানকে বলা হয় ''Ek Swari Gaayana'' অর্থাৎ এক স্বরের গান । সেই থেকে ধীরে ধীরে হলো ''Gatha Gaayana'' — দুটি স্বর, ''Saamagaayana'' — তিনটি স্বর । অবশেষে জন্ম নিল সাত স্বরের কাঠামো — স্বরগম । সম এবং যজুর বেদ থেকে শুরু একাধিক স্বরের প্রয়োগ ।

বৈদিক যুগ সংগীতের যে ধারা শুরু করলো সেই সংগীতের শুধু একটিই প্রাসঙ্গিকতা — ঈশ্বর । এই বৃহৎ বিশ্বকে যিনি অবলীলাক্রমে চালাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে । আমি সংস্কৃত জানি না কিন্তু আমার সঙ্গীত গুরুর কাছে শুনেছি যে ভারতীয় সংগীতের মূল আধারকে অভিব্যক্ত করা হয় একটি অপূর্ব উপমার মাধ্যমে — ঈশ্বরকে যেমন আমরা দেখতে পাই না তেমনি সঙ্গীতকেও দেখা যায় না অথচ প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে ঈশ্বর এবং সঙ্গীত উভয়ই যারপরনাই শান্তি দান করে । সঙ্গীত এবং ঈশ্বর-এর এই ওতপ্রোত সম্পর্কই হলো ভারতীয় সংগীতের মূল আধার যেটা সেই বৈদিক যুগের ঋষি মুনিরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন আর সংগীতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ যে সম্ভব তাও প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন ।

সেই যুগে সঙ্গীত যে শুধুমাত্র গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় । নানাবিধ যন্ত্রও ছিল সেই সময় — তাল ও তন্ত্র বাদনার প্রমাণও আছে যেমন বীণা, তালব দুন্দুভি । স্তবগানের প্রভাত কে উন্নত করতে এই সকল যন্ত্রের প্রয়োগ হত । একটু আগে আমি লিখেছি যে documentation -এর অভাবে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গীত কে আমরা হারিয়েছি । বৈদিক যুগেও যে সঙ্গীতের স্বরলিপি ছিল তা কিন্তু নয় । তবে এইখানেই শুরু হয়েছিল আরো একটি ধারা যা ভারতীয় সংগীতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, তা হলো ''aural tradition'' অর্থাৎ মৌখিক দ্বারা শিক্ষা, পরে যা ''গুরু শিষ্য পরম্পরায়'' রূপ নেয় ।

রাগ সঙ্গীত

বৈদিক যুগে যে সংগীতের কাঠামো তৈরী হলো, তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল পরবর্তী কালের রাগ সংগীতের কাঠামো । এই কাঠামোতে সুর আর তাল হয়ে উঠল আরো সুসজ্জিত । বিশেষভাবে সুরের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক,

মানসিক এবং সময়গত অনুভূতিকে নাড়া দেওয়ার receipe তৈরী হলো । তৈরী হলো এক অতি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক গঠন যাকে বলা হলো ''গ্রাম'' অর্থৎ ৭ টি শুদ্ধ স্বরকে চাপিয়ে তৈরী হলো ২২ টি শ্রুতির octave। সাজ্জা গ্রাম, মাধ্যমা গ্রাম এই দুই মূল octave-এর আধার কে ভিত্তি করে হোলো ১২ টি স্বরস্থান (যেটা আমরা এখন হারমোনিয়াম বা piano তে দেখতে পাই) আর ১০ টি শ্রুতির অস্তিত্ব হোলো ১২টি স্বরস্থানের যে কোনো ২ টি স্বরস্থানের মধ্যে যা শুধু মাত্র sliding musical instrument-এর দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব যেমন সারেঙ্গী, এসরাজ অথবা plucked instrument-এর তারকে bend করে (যাকে বলে মীড়) যেমন সেতার, সুরবাহার ইত্যাদি । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো যে এই শ্রুতির প্রকৃত প্রয়োগেই রাগ-এর মূল রূপটি ফুটে ওঠে যার দ্বারা সঙ্গীত আমাদের অনুভূতি গুলিকে নাড়া দিতে পারে । এই youtube video টিতে পাঠকরা শ্রুতির একটি সুন্দর demonstration পাবেন —

https://www.youtube.com/watch?v=pqjwyBvLfqM ।

এবং এই শ্রুতি কি ভাবে রাগ সংগীতে প্রয়োগ হয় তার demonstration দেখুন আমার এক পুরনো বন্ধু আর fellow musician Praful Kelkar-এর presentation https://youtu.be/DOZP4YrNyko.

সঙ্গীত-দরবার

ধ্রুপদ, যা আধুনিক রাগ সঙ্গীতের পূর্বসুরী, অতি সার্থকভাবে রাগ সঙ্গীত ও বৈদিক সঙ্গীত কে সংযুক্ত করলো । শিব, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার উপর ভিত্তি করে রচিত হলো নানান পদ যেটা হয়ে গেল ধ্রুপদ = ''ধ্রুব + পদ'' । শুরু হলো এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত যাত্রা যা আজও সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হয়ে যাইনি । ধ্রুপদের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৪০০/১৫০০ সালে গোয়ালীয়ের মান সিং তোমার এবং সম্রাট আকবর এর দরবারে এবং তখন থেকে গত ৫ হাজার বছর ধরে গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই সঙ্গীত আজও বেঁচে আছে । কয়েকটি ''ঘরাণা'' যাকে বলা যেতে পারে ''ঘর'' বা family এই সঙ্গীতকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলল । এর মধ্যে উল্লেখ্য হলো ''ডাগর'' ঘরানা । মুসলমান ধর্ম প্রধান এই ঘরে রচিত হতে লাগলো হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা মুলক গীতি । আজকের এই যুগে যখন আমরা নিজেদেরকে global citizen বলে বড়াই করি কিন্তু ধর্মভেদকে ভেদ করতে পারি না, ধ্রুপদের এই বিস্ময়কর উদাহরণ খুবই প্রাসঙ্গিক । তাই নয় কি ? ধ্রুপদ মূলত পরিবেশিত হত যুগলবন্দীতে এবং ডাগর বংশের কয়েক প্রজন্ম আমাদের এই সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন । ডাগর ঘরাণা ছাড়া আছে দারভাঙ্গার মল্লিক ঘরাণা, মিশ্র ঘরাণা এবং আমাদের বাংলার বিষ্ণুপুর ঘরাণা ।

ধ্রুপদাঙ্গের যন্ত্র হলো বীণা এবং পাখোয়াজ । নানাবিধ বীনায় যেমন রুদ্রবীণা বিচিত্রবীণা সরস্বতীবীণা ইত্যাদিতে ধ্রুপদের গম্ভীর সুর ও মূর্ছনাকে পরিবেশন করা হত । আর তালবাদ্য বলতে পাখোয়াজ । ধ্রুপদের গম্ভীরতাকে সাথ দেবার জন্য পাখোয়াজে তৈরী হল জটিল তালের কাঠামো । ১০ মাত্রার সুলতাল, ১২ মাত্রার চৌতাল, ১৪ মাত্রার ধামার এবং ২৮ মাত্রার ব্রহ্মতাল হলো তার কিছু উদাহরণ । এই সকল তালের ওপর নানান composition, বিভিন্ন ঘরাণা আর গুরু শিষ্য পরম্পরায় আজও বেঁচে আছে । যদিও অনেক তাল আর composition কালের অতলে তলিয়ে গেছে যথার্থ্য পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষা ও শ্রোতার অভাবে ।

খেয়াল

মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে নিয়ে আসে পারস্য সংগীতের প্রভাব । সেই সঙ্গীত এর সাথে ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে জন্ম নিল খেয়াল । এই মিশ্রণের প্রধান কারিগর হলেন আমির খুস্রু, যিনি আলাউদ্দিন খলজির সমসাময়িক অর্থাৎ ১২০০-১৩০০ সাল । তিনি তৈরী করলেন সেতার (''সেহ'' — তার মানে আরবী তে তিন তার), তবলা এবং জন্ম দিলেন খেয়াল গানের । খেয়াল এর কাঠামো ওই ২২টি শ্রুতির ওপরেই তৈরী হলেও, তা ধ্রুপদের তুলনায় হালকা ছিল । যার জন্য আমির খুস্রু পাখোয়াজ ভেঙে তৈরী করলেন তবলা এবং এই সেতার ও তবলা তার লেখা বিভিন্ন composition -এ বাজানো হত । অর্থাৎ তৎকালীন যুগে খেয়াল ছিল contemporary আর ধ্রুপদ ছিল classical সঙ্গীত ।

তবে আধুনিক খেয়ালের জন্ম আরও অনেক পরে ১৭০০ সালে, বাহাদুর শাহর নাতি মুহাম্মদ শাহ-এর আমলে । এই খেয়াল গানের জনক হলেন সদারাং এবং তার ভাইপো আদারাং ।

সঙ্গীত — সমাজ ও সাধারণ মানুষ

সঙ্গীত, যার স্থান ছিল উপাসনালয় বা দরবারে, তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো সাধারণ মানুষের মধ্যে । জন্ম নিল চলিত ভাষায় লিখিত এবং উপজাতীয় সঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত লোকসঙ্গীত । ভারতের নানা ভাগে নানা ভাষায় এবং

নানা সুরে লোকসঙ্গীতের প্রভাব সাধারণ মানুষকে ভাসিয়ে দিল । রাজস্থান থেকে পশ্চিম বাংলা এবং কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ মধ্য ভারতে তৈরী হল নানান তাল ও ছন্দ । এই তাল ও ছন্দ মূলত ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার, অর্থাৎ অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং সহজ । লোক গীতির পাশাপাশি জন্ম নিল ভক্তি গীতি । উপাসনামূলক গায়ন এর সঙ্গে এই সঙ্গীতের দুটি বড় তফাৎ — এক হলো এই গানের বিষয় হত মূলত ধর্ম বা কোনো নির্দিষ্ট দেব দেবী এবং তার ভাষা — সংস্কৃত না হয়ে আঞ্চলিক ভাষা । বাংলার কীর্তন তথা অন্যান্য লোক সঙ্গীত এবং ভক্তি গীতির ওপর রাগ সঙ্গীতের ছায়া ভীষণ ভাবে দেখা যায় ।

সঙ্গীত-বিনোদন ও চেতনা

এরপর এল সময় যখন সঙ্গীত শুধুমাত্র অন্তর্বর্ত্তী আনন্দ সন্ধান-এর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইলো না । সঙ্গীতের মধ্যে মানুষ বিনোদনের রাস্তা পেল । দরবারী ও সামাজিক, দুই প্রেক্ষাপটেই সঙ্গীত হয়ে উঠল জনপ্রিয় । তবে এই সঙ্গীত কিন্তু ছিল রাগাশ্রয়ী । যেমন ঠুমরী, দাদরা ও গজল হয়ে উঠল দরবার ভিত্তিক বিনোদন সঙ্গীত, তেমনি কাজরী, চৈতী, হরি, সাওনি ইত্যাদি হয়ে উঠল সামাজিক বিনোদনের উপায় ।

এরপরে এল যাকে আমরা বাঙালিরা সোজা সাপ্টা ভাষায় বলি ‘‘গান’’ । অর্থাৎ কবিতা যা সুরারোপিত হয়ে পরিবেশিত হতে লাগলো । কবিতার ভাষা প্রাথমিকভাবে হিন্দি, উর্দূ অথবা আঞ্চলিক এবং তার সুর হল রাগ ভিত্তিক অথবা নানান সঙ্গীতের মিশ্রণ-লোকগীতি, পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গীত । এই সঙ্গীতের নিজস্ব কোনো পরিচয় (identity) না থাকলেও এর জনপ্রিয়তা exponentially বাড়তে থাকে এবং সঙ্গীতের জগতে আরেকবার বিপ্লব আসতে শুরু করে ।

বিংশ শতাব্দী শুরু হলো সঙ্গীতের নতুন ধারাকে নিয়ে । বাংলা সঙ্গীতের জগৎ হয়ে উঠল সমৃদ্ধশালী । কবিগুরু, কাজী, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও আরও সব সনামধন্য কবি ও গীতিকার বাংলার সঙ্গীতের আকাশকে করে তুলল তারকাক্ষচিত । এই গানই হয়ে উঠল সামাজিক চেতনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল medium ।

সঙ্গীত-শিল্প ও ব্যবসা

৩৫০০ বছর ধরে ‘‘হাঁটিহাঁটি পা পা’’ করতে করতে ভারতীয় সঙ্গীত এসে পৌঁছল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । আধুনিক গান, চিত্র গীতি হয়ে উঠল শিল্প । সঙ্গীত হলো commodity । শুরু হলো সঙ্গীতের কেনা বেচা । Industry, technology, mass production এবং নানাবিধ ডিস্ট্রিবিউশন মিডিয়া Record, Tape, CD । এল cinema তৈরী হলো বলিউড ও নানান আঞ্চলিক চিত্র তৈরী করার কারখানা । জন্ম নিল সঙ্গীতকে ঘিরে নানাবিধ নূতন পেশা-lyricist, music director, arranger, sound recordist, sound engineer ইত্যাদি । এল সঙ্গীতের economics-চাহিদা এবং সরবারহ । ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে মিশ্রিত হতে লাগলো পাশ্চাত্য সঙ্গীত । প্রথমে শুরু কিছু কিছু পাশ্চাত্য instrument-এর ব্যবহার । তার পর হলো পাশ্চাত্য সুর ও তালের ব্যবহার । এবং বিংশ শতাব্দীর অবশেষে ব্যাপারটা খানিকটা উল্টো রূপ ধারণ করতে শুরু করল । অর্থাৎ পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রধান একটা কাঠামো । তার উপর ভারতীয় ভাষায় লেখা lyrics । জন্ম নিল আরেকটি সঙ্গীতের ধারা বাংলা ব্যান্ড ।

আমার লেখা এবার শেষ করব । শেষ করার আগে কিছু কথা, যা একান্তই আমার অনুভূতি । সঙ্গীত এমন একটি দান যা সময়, ধর্ম, সমাজ, জাতি বা ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে রাখা যায় না । তাই প্রকৃত সঙ্গীতের ভাষা Universal, আর প্রকৃত সঙ্গীত হলো সেটাই যা মানুষের অন্তরকে ছুঁতে পারে স্থান, কাল ও ভাষা নির্বিশেষে । আর যেহেতু মানুষের অন্তরেই ঈশ্বর বিরাজমান, তাই সঙ্গীতই হলো ঈশ্বর কে অনুভব করার একমাত্র উপায় । Music is Divine.

References

http://www.itcsra.org/sra_hcm/sra_hcm_chrono/sra_hcm_chrono_index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Indian_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhrupad
http://www.sathya.org.uk/resources/books/history%20of%20music/Vedic.php

---

Subhasis Mukherjee, a senior insurance IT strategist by profession and an avid tabla player by passion, lives in Chicago, USA for last 19 years. Subhasis currently works as an Assistant Vice President in Zurich Insurance Group, a multinational properly & casualty insurance company. However he spends a lot of his time playing, teaching and performing tabla all over US, as a solo performer and accompanying visiting artists from India as well as US based artists. He is primarily a classical tabla player.

The Wind Pipe

Abhijit Mukherjee

I did not cry at the moment of my birth. The deluge came after a few slaps from the rather well built doctor friend of my father, and it never stopped. The members of my mom's family tried all their tricks to pacify me, without result. At that time my uncle who had taken inspiration from the legendary Gangaram and had strengthened the pillars of succeeding in matriculate examination through nine successive attempts was preparing for the tenth time. I or my incessant music became the raison d'etre for the tenth time and in his wrath he named me Bhenpu (a trumpet made of palm leaves that the children got whenever they visited a village fair and never stopped blowing at it until an elder broke it in anger). The name sticks to me even today.

As I grew up, the embarrassment due to the nickname also grew. The name reached my school before I could set my foot into its premises. I came back, wailing as usual, and refused to go back to school again. Only one of my dad's bed time stories could persuade me back to school…

There was a demon princess in the distant *Demonland*. She was fair as she was pretty. Her parents named her Rupshayori (the lake of beauty). One day, Rupshayori came out with her best dress on to go to a dance party with the prince of *Giniland*. All was nice and all was fair. From nowhere came a naughty cloud and squirted a few drops of rain on her. The rain spoilt the dress and the mood of the princess. She threw an angry look at the cloud, took a deep breath and puffed at the cloud. This was no ordinary anger! It created such a storm that it reached the skies and all the clouds came down in rains. The clouds could do nothing with all their thunders. From then on out went the blow whenever she saw a cloud and down came the rains. There were very few clouds left in the sky floating uneasily to avoid the *Demonland*.

Once the clouds met on an island called Mumbai (that's where I lived at that time) to find a way to stop the princess. There lived a little boy, Bhenpu, with a magic trumpet. Whenever he played the trumpet every listener would stand still. When he heard that the clouds were conspiring to kill the princess he offered to go with the clouds. “May be, with my trumpet, I shall be able to stop the princess to blow at you”, he said. An adventure trip riding the clouds to the land of the demon princess! He loves nothing better.

As the clouds drew cautiously to the Demonland out came the princess like a cheetah and took a very deep breath in. Just then reached the tune of Bhenpu's magic trumpet the princess' ears. It was the lullaby Bhenpu's mother sang every night. The princess' eyes closed and she fell asleep.

All the clouds came down and swooped the princess up high in the sky. The waves of the deepest ocean were hissing below to gulp her down. “Halt” said Bhenpu, “Don't throw her in the ocean. I shall ask her not to blow at you and she will obey.” The clouds were in no mood to listen but the oldest of them with the longest flowing white beard said, “Look, at her!” Two pearls of tears were glittering on the long eyelashes of Rupshayari. The clouds looked back at Bhenpu.

As the clouds put the princess back on ground her eyes opened up with a curious look of delving in bliss. “Please take me to the musician who plays such sweet tunes! I have never slept so peacefully in my life.” Bhenpu played a dance tune in Raag Bahar. Rupshayari remained transfixed only her little head started swinging in the beat of the music. She prayed “Will you please be my guru and teach me music?” Bhenpu said, “Gladly, but for a fee!” “Any fee you would like. All my fathers treasures are for you”. “I only ask the life of the clouds as *gurudakshina*.” The princess lowered her gaze with a shy nod that rippled in her beautiful tresses. The clouds performed a rain dance around the two of them with Bhenpu's music and Rupshayari's dance.

Even today when the epidemics strike, wars destroy or violence breaks out I instinctively reach for the elusive magic trumpet to give the healing touch of a rain dance. From heaven the stars twinkle, like dad smiled so long ago.

Abhijit Mukherjee is a Professor of Civil Engineering at Curtin University, Western Australia. He loves to read world literature, travel to well known and unknown destinations and above all, taste all kinds of cuisine. Dynamics of human relations interest him. Abhijit is an occasional writer of fiction and plays.

''তবু তুমি নেই''

সুপর্ণা চ্যাটার্জী

তবুও আজ
আম হিজলের বনে জ্যোৎস্না এসেছিলো
স্বর্ণলতা সূর্য উঠল পুব ঘেঁসে সেই
সোনালী চিলের ডানায় সন্ধ্যা এল ফের
তারার আকাশে নির্লজ্জ চাঁদ
হেসে, উপহার দিল আরো একটা রাত ।

সোল দিঘির জলে ডাহুক পাখী
পাশে ঘুরছে কাদাখোঁচা মাছ রাঙা
শীতের চাদর ছড়িয়ে তবু ও
পাচ্ছি ঠান্ডা হাওয়া, সেই ।
ঝিঁঝিঁর ডাকে বুঝি,
সন্ধ্যা এল ফের ।

নরম ভেজা অনেক দিনের জমানো স্মৃতি
মাছ রাঙার ঠোটের ধারে ধরা
হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখি বার বার
বুদ্ধ, খৃষ্ট Da Vinci-র পটে আকাঁ
মোহময়ী Monalisa
সময়ের তুলিতে বদলেছে রঙ ।
হঠাৎ মনে হলো, ওরা সব
কাছের বড়ো আজ
Monalisa-র চোখে দেখি কোমলতার ছোঁয়া,
তার বাঁকা হাসিতে পেলব মাটির টান ।

জীবনের ঝড়ে, জানি ঝরে যাব সেই
তবুত অনেক না ঘুমের ভোর
না বলা কথার তার
আর সবুজ মাঠে জীবনের রঙ,
এ সব না পাওয়ার হিসেব
রাতের Swan এর ধারে রেখেছি তুলে,
যত্নে, আদরে, অভিমানের বাষ্পে ভেজা
এক রাস স্মৃতির কথা ।

ভেবেছি তুমি একা,
তোমাকে ভালবাসবে কে সেখানে ?
বুকে ধরে রেখে,
যত্নে, পাটে, চুল টান টান ?
সৃষ্টির আহ্বানে দেবে কি তবে সাড়া ?
প্রশ্নটা ঘুরছে, হাওয়ার হাত ধরে
সমুদ্রের সাথে, ঢেউ হয়ে
আছড়ে পড়ছে বার বার
সাদা ফেনা হয়ে
হলুদ বালির সাথে মিশে
একাকার ।

প্রশ্ন আবার সেই
সৃষ্টির আহ্বানে
দেবে কি তবে সাড়া ?
চিনে নেবো, রইল অঙ্গীকার
শতাব্দীর সীমানায়
প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমার ।

আরে সেই কবেকার কথা, ''সাধারণ মেয়ে'', তবু তার তকমাটা রয়েই গেছে বাঙালী ঘরে । সুপর্ণা তার একঘেঁয়ে সংসার স্বামী ও দুই ছেলে আর দশটা পাঁচটার চাকরী আবর্তে ঘুর্ণীয়মান সাধারণত্বের আর একটা পরিসংখ্যান কেবল । তবু সব কিছু ছাপিয়ে, তার ভাললাগার জায়গাটুকু আকঁড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে প্রতিদিন । সাহিত্য চর্চা তার কাছে ঠিক যেন ভোরের শিশিরের মতো । সংসারের ব্যস্ততা বেড়ে উঠতেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়, আবার আর একটা শিশির ভেজা ভোরের অপেক্ষায় ।

The Street Venders

Indrani Mondal

Amidst the daily evening crowds

Jostling to get home in street dust and fumes,

the crammed street venders spill all along the uneven pavements

flaunting their wares in unabashed abandon,

from bewitching eateries;

serving piping hot savory onion fritters

gurgling and spluttering in the murky hot oil of giant cauldrons,

brick red skewered kebabs

smoking in blazing make shift pits,

or flatbreads with a cracked egg on top

fried to pungent perfection then rolled with chopped salad

plump lentil stuffed pitas dipped in spicy potato curry,

along with the ubiquitous tiny terracotta cup of sweet milky tea;

to sculpture stalls of sedate clay images of Gods and Goddesses

with intricate colorful adornments,

useful household tools, keys, almanacs

to binding and restoring old manuscripts,

junk jewelry from scarps of metal, wood and stone

ingeniously strung for every size, shape and taste,

colors, flavors, smells

gone wild in ad hoc frenzy,

as I run into bustling bodies just by standing to admire,

a common risk here taken in stride,

but for me

a wonder at every step

a discovery at every turn

a gasp, a choke, a stumble

ending nevertheless in an unexpected chuckle often

at the marvel of assertive life,

a pang of guilt sometimes or an unshed tear

at the unabated flow of talent

so cheaply spent, so easily squandered,

from the gnarled sculptor, the talkative painter,

the prayerful weaver, the wise book binder

the sprinting cartoon street actor

to the innovative boy cook,

all unsung heroes of their evolving destinies every day,

an encounter with awe even reverence for me

at this coming face to face with so many palpable hungers

some alien and remote maybe

but incredibly resonant even now

this sheer thrust for survival

that manages to fire, mold and define

my loves and hates

move the tectonic plates of my world

so many decades and latitudes away.

Chicago, IL

My Spoon

(Inspired by Mayi Ojisua)

Tinamaria Penn

I must carry my spoon in my pocket
As I wander
From village to village
My family takes it for granted that where
I am there are spoons
But I know better
I have learned from my past travel to my friends
That they eat with their hands
But not me

I show off
I have my very own spoon
To carry to wherever I will go
Eat what I want and how I want to eat with a spoon
My spoon
I announce one day that
I will carry my spoon to America
They laugh at me
and
I laugh too
Knowing that they do not know my density

Now I sit
At America's table
Where the table is completely set
So it seems
But, I still carry my own spoon
Because there is something that is missing
Something that this great America seems not to see
There is no spoon
No spoon offered
Not even to the hands of my childhood friends
Who may never eat with a spoon

Chicago, IL

Christmas, 2015

Viola Lee

I have tried many times to write a poem
a poem of thanksgiving for all those things
that are a part of this world,
but each time the poem never works.

It always ends up broke
left sitting still on the branches in front of the house
with the ice and the sleet
or somewhere entwined
in the ropes of the spider park down the street
or in traffic on the interstate
crumbled piece of paper
a note wet with rain
stamped with tire markings.

I have tried many times to write a poem
that prefers trying indoors
where it is warm with everyone
with all those now waking
and jumping into bed with us.

A poem that becomes the knife cutting
all those green beans
that we will take over
to my sister's house for dinner tonight.

Early dinner because everyone has children
and we all need sleep,
A poem that becomes
the noise in the living room:
the television, that one more episode of Arthur,
the xylophone that bangs and bangs on and on
those little fingers at work
one day writing out our eulogies
A poem that becomes that warm cup of coffee
and that little bit of rice milk left
that spoonful of brown sugar
and that huge shout out
to that person who just handed the cup to me.

That poem will become
all those who take part in providing me
with this cup coffee every morning,
for my parents who made
these lips and throat and stomach, body
for all those who have helped to
design this French Press
this one style that I love so much
and curse often

for the drivers and farmers and workers and rosters
for the counties that continue
to make all of this
continue to design this French Press,
for the crying that I hear in my living room,
for the nursing that I have managed to do
for the past eight months
and how each day I say,
will this be the last,
and yet, how this growing being,
needs it to happen right at this second,
for the fact that my body just does it naturally,
makes this milk and keeps a human being alive,
how it is both a miracle and science combined,
and how it is an absolute mystery–
when other infants cry
and what the crying does to my very own body.

Chicago, IL

গোরস্থানে হেমন্তের বিকেল

আনন্দ সেন

এখানে হলুদ আর লাল আকাশের দরজায়
এখানে আগুনের বুকে পাতারা মুখ লুকায় ।

এখানে পায়ে পায়ে পথ চলে গেছে বহুদুর
এখানে আঙ্গুলের ফাঁকে লুকোচুরি খেলে রোদ্দুর ।

শেষ হয়ে যাওয়া স্বপ্নেরা দল বেঁধে পরে পীতবাস
এখানে নরম মাটিতে মৃত্যুরা শুয়ে বারোমাস ।

এখানে দিনের কোলাহল এসে থেমে গেছে চুপ
এখানে ত্রস্ত হরিনের গালে চুমু খায় ছায়াধুপ ।

চলতে চলতে থমকে থেমেছি জংলা পথের পাশে
এখানে ফলক বসে আছে কথা ফুরনোর অভিলাষে ।

পাতা ঝরে যায়, সন্ধ্যা ঘনায়, জোনাকিরা বাতি জ্বালে
মরা আলো মেখে পাথরেরা শোনে, গল্পের কথা বলে ।

কারও ভালবাসা আসেনি জীবনে, কারও হাঁটা পথ সর্পিল
সুখ কারও সুরে ঝরনার জল, কারও রূপকথা ঝিলমিল ।

গল্প অনেক, অনেক জীবন, যাই বলে গেল কারা
বনতল মোড়া চাদরে আঁধার, পাহারায় থাকে তারা ।

পশ্চিম থেকে ছুটে আসে মেঘ, বাতাসে ঝড়ের সাজ
নামহীন কোন ফুলের গন্ধে পৃথিবী মেতেছে আজ ।

বৃষ্টিধারায় মিশে যেতে যেতে হাওয়ার শব্দ শুনি
মরণকে বাম পাশে রেখে আমি জীবনের দেনা গুনি ।

Ann Arbor, Michigan

Calcutta Cuisine

Balarka Banerjee

There has always been something a bit different in the air in Calcutta. And it's not just diesel fumes. It's something more internal, more in our blood. We Calcuttans have been exposed for a very long time to such diverse ethnic and period influences that we have evolved in a most intriguing fashion indeed. This makes us so frustratingly difficult to define, stereotype or type cast. Unleashed upon the rest of the country, and now the world, we tend to bewilder people by our contradictory, cross pollinated natures which shine through in everything we love and loath. While to us, the mutton loving Brahmin, the dhoti wearing Oxford accented gentleman, and rosogolla downing, pocket watch carrying communist seem like everyday characters they tend surprise people not entirely familiar with us.

They say that the history of food is often the history of a people. Indeed, the eclectic mix of cultures (to be more precise "kalchars") that is we Calcuttans, is reflected perfectly in the cuisine that we have so lovingly evolved over time. If we look closely, in Calcutta itself you can find culinary influences from Chinese, Tibetan, Thai, Afghan, British, Scottish, Irish, Armenian, Jewish, Burmese, Persian, Pakistani, Italian, French, Swiss and many other ethnicities. Add to this the varied national influences such as Punjabi, Sikkimese, Malayali, Goanese, Maharashtran, Hyderabadi, Gujarati and so on and you have an almost unending bouquet of variety. However, the best part about food in Calcutta is that that the best of it is often not found in the fancy restaurants, cafes or bistros that one would see and naturally be more familiar with. On the contrary, to truly experience the delights of Calcutta "cuisine" one would have to venture out of their comfort zones. Leave behind their air-conditoning, black tie waiters and ambient music and head towards dingy holes in the wall, stalls under blue tarp or familiarize one's self with the concept of sitting in a cabin (or to be more precise "kebin"). That is why, fine dining Calcutta style is more than just a meal. It's an expedition. An adventure. A search. And sometimes (not that often) a test of one's courage and gastric tenacity. If you ask a true Calcuttan where one can find the best rolls, or chilli chicken or kochuri they will invariably name same unusual unheard of place and give you a lengthy discourse on why that particular food from that particular place is inarguably the finest in the world. If you ask a second Calcuttan the same question he will give an entirely different answer and spend the next few hours arguing with the first chap. Therefore, it is impossible for my humble self to reach any sort of conclusion as to the "best in West Bengal". It is equally infeasible for me to cover all of the mentioned culinary varieties that Calcutta has to offer. However, I will most certainly try to present some choice Calcutta cuisine that one might be somewhat less aware of.

One of the great pillars of Calcutta snack food has to be the deceptively simple and absolutely mouth watering "roll". Traditionally it consists of chicken or mutton kebab wrapped in paratha. On a hot tava, the paratha goes on first and bakes until it is crisp, golden and deliciously flaky. At this point a whipped egg might be poured onto the tava and carefully topped with the paratha. Once it cooks through the egg coated paratha is laid on its back and tender kebab pieces are laid in its bosom and wrapped up snuggly. The whole construction tastes delicious and is the perfect one handed snack. Never overstuffed and never under it goes down in minutes and leaves the taste buds begging for more. The history of the roll (or "kati roll") is somewhat foggy and steeped in mythology. Its first appearances can be traced back to as early as 1932 in Calcutta. Nizam's is

widely credited with the invention of the kati roll as we know it today. Legend has it that on a particularly busy night the restaurant was running out of plates as there was a long string of orders for paratha and kebab. Which is when somebody came up with the ingenious idea of wrapping the two together, thus eliminating the need of plates altogether. Nizam's has always prided itself on serving, the best, the most original and unadulterated rolls in town. In the golden years of 60's and 70's its fame was widespread and it was as much a landmark in central Calcutta as New Market or Globe cinema. A massively built Afghan man used to roam the streets around the cinemas in the evening particularly on the weekends. Known as "pehelwan" he would come up to people as they parked their cars for the evening show and took their orders for kati rolls. Sure enough, he would arrive with them, warm in his hands just before the show would start. "Pehelwan" is long gone now and so has a lot of the charm of Nizam's. Despite several other places where you can get a roll now there is still something special about a Nizam's roll. Sure they may have had to make concessions by selling paneer rolls and downsizing considerably, but the elderly lungi clad mullah who makes them still looks as gruff as ever. He gets snappy if you start asking too many questions about the spices and once snatched away a roll from a friend of mine who requested him for some chilli sauce.

The roll itself has been corrupted gradually over repeated copying and modification. In some places, the filling is not kebabs anymore, and has been substituted by a spicy curry like mess. A number of condiments go in the rolls itself, such as cucumbers, capsicum, tomatoes, chilli sauce, ketchup, and chutneys. "Arsalan" in Park Circus even makes a roll with Cheddar cheese. Not that there is anything wrong with that. I personally adore the double egg chicken roll from Anamika (a road side stall in New Alipore) which is as corrupted as it gets but is the one of juiciest, tastiest rolls you will ever have. Nonetheless there are many of the traditionalists still left and they do a fantastic job indeed. Some choice ones are "Kusum", "Hot Kati Rolls" (on Park Street, below the Asiatic Society building, you can't miss the aroma when you drive past), Campari, Beduin (Gariahat), Badshah (New Market) and Dhaba (Ballygunge Road). My personal favourite however is a little hole in the wall at the end of Theatre Road (Shakespeare Sarani), opposite the Sahara building. Their mutton rolls are simply addictive.

Old fashioned Mughlai food has been a mainstay of Calcutta for a fairly long time. When the Mughal kings ruled Bengal, the rich aromatic meat dominated cuisine was widely prevalent but perhaps not as popular among the locals. With the conquest of Bengal and the fall of Shiraj-ud-Dullah that type of cuisine diminished quite a bit and was restricted to certain pockets of society only. However, after the failed revolt of 1857 the last Mughal king in Delhi, Bahadur Shah Zafar, was chased out of the capital. He fled to Calcutta with the remnants of his family and staff and was ultimately exiled to Yangoon, where he died soon after. However, most of his staff, servants, and cooks stayed behind in Calcutta. By that time, the people of Calcutta itself had changed into a more versatile, cosmopolitan and open minded breed. It is believed that the highly trained cooks of the food loving Bahadur Shah revived the Mughlai cuisine in Calcutta in the late 19th Century. Many of the older Calcutta restaurants and eateries are said to have been started by them and has shaped Calcutta's love for its unique style of Mughlai cuisine.

The mainstay of Mughlai cuisine is the Biryani. Biryani is fragrant long grained rice, slow cooked with goat meat, potatoes and the key ingredient, saffron among other spices in ghee. It is the very epitome of the sinful decadence of the Mughal empire. Unlike some of the more derivative versions, original Biryani is cooked with a surprisingly few number of ingredients and almost always with goat meat. The Calcutta biryani, is satisfyingly similar to its more authentic Lucknow or Agra counterparts and is absolutely delicious. People have gone to war

over which Biriyani in the city rules supreme so that is not a controversy I want to get into. However, it suffices to say that most of the best biriyani can be found at the crossing of Park Street and AJC bose road. Rahmania, Lucknow and Shiraz are located right there. As a matter of fact, that is the start to something a "biriyani strip" in the city which stretches up to Park Circus. Next time you are there, try it with some "chicken chaap" and definitely ask for some of the digesive yoghurt-mint drink to wash it down.

On the subject of Mughlai, one must mention the Bengali equivalent of "comfort food", Moglai paratha. The origins of this delicacy is quite vague but it sounds like another brilliant kati roll like deviation. This is basically minced meat and whipped egg stuffed into flaky white bread. Served with a salad of red onions. It is fairly tricky to make so a good moglai paratha is hard to come by, but one place that has mastered this delicacy is Anadi Cabin on Jawaharlal Nehru road (just two clicks from Esplanade). Their absolutely divine preparation ensures that you will almost never be able to find a seat there upon arrival. If you haven't eaten at Anadi Cabin you have missed out on a Calcutta institution no less significant than the Victoria Memorial. While there, try the pudding. Trust me, it's not what you would expect.

Let's move on to something a bit more international namely British. The "chop cutlet" culture of Calcutta is somewhat unique. Definitely a delicious Raj hangover. But don't expect the rather mild and insipid meat preparation of the UK. The chop cutlets of Calcutta have been changed so greatly that it has been completely emancipated from its heritage. With delectable results. These are rich, fiery, spicy and complicated affairs. Apart from the usual mutton, chicken and prawn you also get some unusual ones. Such as the kabiraji cutlet, a chicken cutlet with a whipped egg coating that gives it a furry golden look and a delicious crunchy texture. This too is a rare delicacy. There are several imposters and copy cats around, the genuine article is hard to find. One of the best kabiraji cutlets I have tasted comes from a restaurant on M.G. road called "Dilkhusha". Last time I was there, they claimed to be the originator of the dish. Although details are specky they believe it was created for the British palate in the early 1900's. The name had always mystified me as "kabiraji" in Bengali refers to herbal medication. I could not make the connection between cutlet and herbal drugs except for the fact that overindulgence of the former would definitely require the latter. But I was told by the owner of Dilkhusha (mira-di, if I recall correctly) that the original name was coverage cutlet (referring to the egg white coating) which devolved into kabiraji in the local dialect. As a matter fact, it was called "fowl kabiraji cutlet" on their menu for many many years and that too was replaced by "chicken kabiraji".

As far as meat cutlets go, I must mention "afghani cutlet" at the college street coffee house. I will refrain from discussing the coffee house itself, because volumes can be written about its tradition, heritage and ambience. Little is usually discussed about its food or drink. Perhaps rightly so because I personally believe their coffee tastes like flavoured rain water. Nonetheless, the afghani cutlet must be mentioned. It's a mutton cutlet the size of one's palm but cooked with some unusual spice combination and most notable, raisins, currants and nuts. Overall it has a sweet and salty flavor, which is quite unique and is served with a slightly runny gravy which soaks up nicely in some bread.

If the presi/CU crowd claims dominion over the mutton afghani, the Jadavapur gang brandish their "dhoper chop" in reply. Milonda's canteen came up with the treat (whose name in colloquial Bengali translates to "rubbish"). It's half a boiled egg and half an ambiguous (but tasty) filling, coated in breadcrumbs and fried. May not sound like much but it does taste delectable.

Instead of mutton and chicken if you prefer fish then you must try the fish fry and possibly the fish roll. The fish fry is traditionally seasoned bhetki coated in breadcrumbs and deepfried. The fish roll is more creative. It's a bhetki fillet rolled

around a stuffing made out of another pureed and seasoned fish flesh (usually carp). Also coated in breadcrumbs and deep fried. Both of these are hard to find in their nascent forms. Cheaper copies tend to be heavy on seasoning and lean on fish. The undoubted leader for both is "Bijoligrill", originally located near Bijoli cinema in Bhowanipore. They are also a premium caterer for marriages and other social functions so next time you are in Calcutta try to get yourself invited to an upmarket wedding.

Tibetan food has caught on off late in Calcutta and is the newest addition to the Calcutta snack cuisine smorgasboard. Momo's are Tibetan dumplings made off a garlicy meat stuffing, best enjoyed with a hot chilli sauce and a light spring-onion soup called thupka. A few Tibetan families had started the trend decades ago when they used to make these momo's in their own kitchen and sell packets of them well informed foodies out of their living room. One of the better known of these families lived on Elgin road. As the elderly family moved on, the place was converted into a restaurant which soon became a series of restaurants. The better known of these is Momo Plaza which is located of street now known as Suburban Hospital Road. The décor is shoddy (almost scary), the tables and chairs are weak but the food is to die for. They serve momo's and a lot of them. There is the classic steamed ones or the tastier fried ones and then a lot of evolved ones culminating in the "pan-fried chilli momo's" which is only for the brave of heart.

Chinese food in Calcutta has also been a long tradition. It is now so well assimilated into Bengali food habits now that it is sometimes impossible to think of it as foreign. As a matter of fact, Indian style Chinese food is now widely accepted as a style unique and singular like Singaporean or Malaysian Chinese. It all started, from a group of Chinese immigrants, predominantly from the Hakka and Cantonese provinces, who settled in a part of Calcutta known as Tiretta Bazaar. Even today that is where you go for the real thing. There is a Chinese street market at Tiretta bazaar on Bentinck Street. It sets up at around 5:30 am and is sold out by seven. It is not strange or surprising for Calcuttans to stay up all night, clubbing, driving or simply sitting around indulging in adda. When the night seems to inexplicably disappear and your friends start feeling hungry, it's time to hit Tiretta Bazaar. Street vendors mostly sell homemade traditional Chinese food. There are light soothing broths with fish ball or chicken feet. There are heavier schezuan broths which can lift the top of your head right off but works great against a hangover. Then there are steamed buns, dumblings and spicy sausages. The smells and sounds are intoxicating and its seediness as its charm and somehow only in Calcutta does it not seem unusual to be starting a Sunday morning like this.

For more authentic Chinese food one must always venture to Tangra. That is no secret at all. Although there are quite a few more mainstream restaurants there now, there are still a few old fashioned ones, which we always seek out. When you go to those, the cook-cum-waiter takes your order. He brings you some beers and you are expected to take your time with them as he goes around back to catch a chicken for your chilli chicken. It's plucked, skinned and cooked right in front of you. Just be careful when you order "one chilli chicken please" as it can actually be an entire chicken cooked for you. Like almost every type of food, Chinese in Calcutta has evolved and changed, adapting itself to the local palate and ingredients. Now, there is a Chinese restaurant on every corner and road side stalls will toss up chow-mein, chilli chicken and fried rice alongside egg-rolls. If you can put aside puritan tastes then you might just indulge in and enjoy some of the local Chinese. I for one love my "hakka chowmein" with its strong pepper seasoning. Chinese food in Calcutta has developed its own language. "Hakka chow" means dry noodles whereas "gravy chow" is cornflour thickened gravy poured over boiled noodles. "Chilli" refers to a dry dish with a thick soy based gravy with finely chopped green chillies. "Manchurian" usually refers to meat or veggies fried in a coating

and dipped in a hot and sweet sauce. So next time you are in Kolkata, give the big boys like Mainland China, or Chinoiserie a pass and try out the Manchurian chicken and sweet corn soup at your dimly lit neighbourhood joint. You might just like it.

The repressive humidity of Calcutta usually takes its toll on people and staying hydrated is very important indeed. Which brings us to beverages. These days with surfeit of Coffee houses it is difficult to see beyond the 50 rupee mochas, cocoas, lattes or the smoothies, slushies and crushies. I have never been a big fan of these establishments and despite their fancy décor the coffee usually still tastes like dishwater. The places are good for teenagers on first dates but if you want a real drink to pick you up, you should try the tea at Balwant's. This pre-independence dhaba on Harish Mukherjee Road (opposite the gurudwara) serves over a thousand portions of Punjabi milk tea a day. Their secret (although probably not the real one) is that they never expose the tea to direct heat. Leaves in a pouch are immersed in boiling water. Once infused, milk is added and the whole thing is placed in a water bath. Regardless of the procedure, the final product is pure elixir. However, if you fancy a more sophisticated tea drinking experience, you must try Dolly's tea house in Dakshinapan. Started by India's first woman tea taster this place has a relaxed, typically Calcutta feel. The tea itself is unique. Not only can you get some cup of the regular stuff you can experiment with fruit blends, ginger ale and lemonade punch, mango tea, grapefruit tea and even one with soda and a dollop of ice-cream. Nonetheless, one of the most refreshing and unique drinks I have ever tasted is “daaber shorbot” at “Paradise” behind college square. The place has been there forever and they make a number of soda or milk shake type drinks. “Daaber shorbot” is an unique blend though made from coconut water mixed with possibly some mint, dash of lime and other things which makes it one of the most refreshing drinks I have ever had.

So there we have it. A small sampling of the vast and complicated variety of flavours and aromas that is Calcutta cuisine. The list is by no means complete or comprehensive. I have made absolutely no mention of Putiram's telebhaja, Ujjala chanachur, the alurdom off Viviekananda park, the phuchkas at Maidan, kosha mangsho from Golbari, phulkopir singhara, mochar chop from Aponjon, dahi vada, mishti doi, rosogolla, or notun gurer shondesh. Alas, they must be saved for another time.

However, the lesson here my friends is that the best food in Calcutta is never where you would expect to find it. Just as most things Bengali, nothing is as it seems. The dingiest, darkest, dirtiest corners of this mad city hide the most mind expanding food you will ever taste. Deep fried in tradition, seasoned with mythology and garnished by a dash of bewildering charm, the food of Calcutta is more than hunger quencher. It's an experience.

Sydney, Australia

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত

পুষ্পশোভিত গাছ তো দেখেছ, দেখেছ কি তার মূলটা ?
গাছের মতন সে প্রায়, যদিও সোজা নয়, ঠিক উলটা
নিজেকে লুকিয়ে চোখের আড়ালে
ভূতল গভীরে অতল পাতালে
মাটির রস সে যোগায় বলেই ডালে ফোটে ঐ ফুলটা ।

সৃষ্টির থেকে এ প্রাণপ্রবাহ নারীর কাছেই ঋণী
মা-বোন-বন্ধু-প্রিয়া-চিরসাথী নানারূপে তাকে চিনি
জীবন নদীর স্রোতে প্রতি বাঁকে
সাহচর্যের হাত তার থাকে
নারীদিবস তো একদিন নয়, সে তো প্রত্যেক দিনই ।

শীতের রাতে হোজ্জাসাহেব ঘুমোন খাটে চড়ে
হঠাৎ সবাই শুনলো আওয়াজ সেথায় ধপাস করে
হোজ্জা চেঁচান, হয়নি কিছুই
জোব্বা আমার পড়লো শুধুই
(অবশ্য সেই জামার ভিতর আমিও ছিলাম ভরে) ।

ছিল অভিনেতা, হয়ে গেল নেতা, এ তো প্রায়ই দেখি সবে
নেতা থেকে হল অভিনেতা, কেন এমন ঘটে না তবে ?
বাপু হে, তোমার বাকি বহু শেখা
সমাজ ও রাজনীতি রূপরেখা;
নেতা, আসলে তো সে অভিনেতাই; নতুন করে কি হবে ?

চন্দ্রগুপ্ত বাঁ পকেটে, ডানদিকে শশাঙ্ক
বুকপকেটে হর্ষ, এবার হিস্ট্রিতে নিঃশঙ্ক
হিপ্‌পকেটে বাবর
শের শা' এবং আকবর
পৌঁছে হল্‌-এ, হায় কি ভুল এ, নয় ইতিহাস, অংক ।

দুই প্রতিবেশী দেশে দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি চলে খোলাখুলি
ভূমি সীমান্তে পাহাড়প্রান্তে অবিরত চলে গোলাগুলি
দুই দেশবাসী, সুদূর বিদেশে
অবাক কান্ড, তারা হেসে হেসে
ছেড়ে দ্বেষাদ্বেষি করে মেশামেশি, রেষারেষি ভুলে কোলাকুলি ।

শুভ্র দত্ত সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি ।

তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে – শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা । নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন – মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি । নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা । বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি ।

Amazing Art of Dokra

Bishakha Dutta

My tryst with dokra was facilitated by Shantiniketan and the haat of Sonajhuri. I was then a student of Visva-Bharati University. The idea of having our evening adda at the Sonajhuri Haat suddenly dawned on me one afternoon. Excited by the prospect of a unique experience, I rallied everyone to join in. Convincing others didn't strain much of my energy or test my skills. We treaded down the red-earthed thoroughfare, crossed by green rice fields, overcame the wax and wane of Khoai to reach the haat venue. As we inched closer to destination, we could faintly hear renditions of baul singers and the mellifluous sound of their dotaras. Decibels rose as we neared the haat and soon we were there!

In the midst of the Sonajhuri forest, the haat is an eclectic mix of colour, celebration, creation and divinity. Sellers with their neatly displayed handicraft wares, buyers in myriad moods and outfits and bauls singing the path to the divine. In spite of it all, a particular style of craft grabbed by mind and attention. A piece of craft I had not seen before. To me, it looked strange in form and substance. It didn't mirror any known god or goddess. It didn't resemble any animal, nor any spear-holding tribal warrior. It was unlike anything I had seen before. The material used was not clay nor was it shining brass. I was intrigued. What did the art depict and what was it made of? Not inclined to make public display of my ignorance, discreetly I asked my friends if they knew anything about the figurines.

"It is called dokra art." I turned around and faced a slightly built, dark complexioned, pan chewing man responding to the novice query.

"Dokra?" I had not heard about it before. "How much are they priced?" I inquired.

"That varies itemwise, madam. Some cost Rs. 200 while some are for Rs. 300. And that Durga motif you see, we sell them for Rs. 3000," the man replied.

Astonished, I asked him why dokra work is so costly.

"These are made from brass, madam," he explained.

"But why aren't they sparkling?"

The man smiled in response.

Having discovered something new, I felt a thrill surge within me. I was feeling inquisitive to know and learn more about this form. I asked him about the place where dokra is cradled.

"Dariyapur," he informed. He offered to take me to the village and show me how the figurines are made. Out of sheer curiosity, I consented. We decided to start our journey from Bolpur station a couple of days later.

I reached the station at the designated hour. The winter chill was still palpable in the morning air. My guide, named Ratan Mondal, kept to his punctuality. He showed up within moments of my reaching it. As I

boarded the train, my elation was overwhelming. Having crossed Bolpur and Bhediya, the train sped past lush green rice fields and stretches of red soil in between. We disembarked at Guskara station and got onto a bus that would ferry us to Dariyapur.

While consenting to and subsequently undertaking the journey, I did not comprehend the magnitude of learning awaiting me. On reaching Dariyapur, I gathered that the place is locally known as 'Dokra Haat.' Producing dokra work must be the traditional profession here. The entire village must be involved in this work, I contemplated to myself. All the houses looked similar with thatched roofs and mud walls. Clay mounds, of different shapes and sizes, lay all around to dry in the sun.

My guide introduced me to Paran Karmakar, a dokra artisan. Probably sensing my eagerness to know about the form, he took pains to explain the several stages involved in production of the figurines that I was enchanted by at the Sonajhuri Haat. Preparing wax for the mold is the first step of the elaborate process. For benefit of readers, it is relevant to state that molds can be made from either wax or a mixture of resin and asphalt.

To start with, several ingredients are mixed with hot, molten wax which is subsequently strained into a large vessel. Once the wax cools and hardens, artisans use it to make molds of varied figurines. The process differs slightly if a mixture of resin and asphalt is used. Clay is then used, instead of wax, for making the molds and designs are created with the mixture. These molds are then coated with soft clay and left in the open to dry. As the molds harden, women of the village get on with their job of putting on the final red clay coating. And another round of sunbathing follows.

These paraphernalia are followed by the important task of making a channel or pathway within the mold. It is through this channel that molten brass spreads and the dokra figurine starts taking shape. Women are entrusted the job of covering the channeled molds with red clay, which are again set out in the sun to dry. Their tender hands also add an elongated portion, to the mold, in which brasschips are kept. Locally, it is known as *Gheriya*. The brass chips are covered with a kind of cap made from red clay. To allow entry of heat, perforations are maintained along the side of the clay cap.

A fire pit is created by vertically lining bricks and the different designed molds are placed inside. The perforated side faces the fire, allowing the brass chips to melt and spread out within the mold. Once ready, the molds are taken out of the pit and carefully hammered. The cast gives away and the dokra figurine emerges in all its glory.

Paran Karmakar's narration about the birth of dokra art finished, but the surge of thrill did not ebb. I learned about a new form and also about the lives of its artisans. Bidding adieu to Dariyapur, I saluted the spirit of this village that has kept the form alive bravely facing all odds.

Graduated in History, I did PG Diploma in Journalism and Mass Communication from Jadavpur University. I did Masters in Journalism from Visva-Bharati's Centre for Journalism and Mass Communication. My passion is to delve deep into the realm of communication; study of film ethics and the language of cinema. From Ray to Truffaut, from Kurosawa to Bergman, cinema fascinates me to no end. I love painting and prefer working in oil. My parents, my school, college and the two universities, as well as my penchant for my passions have shaped my personality.

Sikkim

Shravani Datta

The Indigo Flight took off from Kolkata Airport at 10:30 AM and touched down in Bagdogra after 70 minutes. Baggage cleared without any hindrance and the five of us stepped out to the parking lot to locate our cab driver. He had come to fetch us from our Gangtok hotel, Nor Khill. It was midday already and the outside air was oppressive and sultry. The horns blared till it gasped into cooler quarters. I did not want to stop, but had to for a quick lunch at a local highway restaurant.

Sevak Road, the artery from Siliguri to Gangtok is joined by the Teesta River which ultimately drains in Bhutan. Notable here is the imposing Coronation Bridge, named for the coronation of King George VI and Queen Elizabeth. From here, the Teesta twitches past entrancing villages' aplomb with oodles of charm. Congregations of locals buzzing between main street stores and restaurants appear as we inch closer to Gangtok.

After 5 hours, a little after sundown, our 4 by 4 halted in front of the hotel, Elgin Nor Khill. Set amidst the curated lawns, overlooking the Paljore Stadium, this hotel is a former royal guesthouse. The lobby boasts of an amazing collection of thangkas and paintings, a legacy of the royal family!

Only ten minutes by foot, The MG Road or Mall Road is the shopping area. This swarming market place swanks Golden Tips, a tea lover's paradise. From Mango tea to masala tea, Old Indian tea, white tea and multiple selections of Assam and Darjeeling push you back by 2 hours, to say the least! The manager lays out a tea table that can please royalty and you get to taste and pick! I came out heavier by a couple kilos!!

It was not until dinner in the ceremonial dining hall of NorKhill, that we got our passes for East Sikkim.

The next day was crystal clear and I woke up to an armchair visit of Kanchejungha from the bedroom. Delayed by its magnetic allure, I had to gobble breakfast in haste to hit the road for the day trip on time.

It was a cold day in May and the ascent to Nathula at 14800 feet was not going to be easy. Our four wheeler proceeded first for Tsanghu Lake at 12100 feet.

Thegu village

Sudden cloud cover on Tsanghu Lake

A sudden cloud cover marred my vision, yet the blurred lake water was grey white, unblemished enough to hold my gaze forever.

Yaks flank the area around the lake and curious travelers mount their not so light bodies on the turgid animal- all ever happy to click photographs!

On the way to Nathula, travelers change shoes and slip into boots in the town, Thegu. The highest ATM in India is also situated here.

Further east from Thegu, the drive continues toward Nathula Pass. Finally at 14,140 feet, Nathula looked pretty much like a Chicago backyard after a heavy blizzard. I was already lightheaded from lack of

oxygen and a trifle wind swept with drafts of snow to haze and distort my steps.

The silk route operated through Nathula, till 1962. Once the trade route between India and Tibet, today the lofty pass stands with Chinese and Indian soldiers guarding their border. A stairway leads to the border where The Nehru Stone, marks the visit of the former PM of India. (No photographs allowed)

There is so much of kindness and hospitality in the people of Sikkim. The Lepchas, Bhutiyas and Sherpas intermingle and I cannot tell the difference. It does not matter: what stays is the balmy welcome of a hot cup of tea or Wai Wai noodles to a tired sightseer! We head back to Tibet Hotel for late afternoon lunch on momos and thupka.

Still heavy with lunch our troop strolled in to Baker's Café on Mall Road. The sun was down and we could not get the valley side view, but gorged on the sinful apple crumble, lava muffin and hot chocolate.

The North Sikkim passes, granted for 4 days had arrived. It is only open for tourists from May to September.

It took us half hour to get out of Gangtok. On our way, we stopped at the Directorate of Handicrafts and Handlooms, which is the state run emporium of handicrafts. This had an array of colorful carpets, masks, lacquered tables called choksis and handmade paper. Our Bolero, zipped through Ganesh Tok, Hanuman Tok but could not do the ropeway, it was closed following the ripple effect of earthquakes in Nepal.

The car crawled through Gangtok traffic passing suburb of Deorali and stopped at the Rumtek Monastery, which is undoubtedly the largest monastery in Sikkim. Built by the fourth Chogyal, It had to be rebuilt after being wrecked by an earthquake. This is also the home of Kargyupa sect of Tibetan Buddhism and a seat of Buddhist learning or Dharma Chakra Center. At least 500 monks at a time engage in picking up skills to propagate the tenets of Buddhism.

When our vehicle finally hit the North Sikkim Highway, it was past noon and time for lunch. We kept moving along the road for 38 kilometers, and gradually lunged in to the Phodong Monastery. This Kargyupa Gompa, originally built in 18th century was recently rebuilt but the original frescoes and paintings were preserved. Significant among these is the striking

(Rumtek Monastery)

fresco, Bhava chakra, or the wheel of life. This is one of the basic expositions of the fundamental law of Buddhism; man is entrapped in the recurring cycles of rebirth and their attendant suffering.

The wheel is a large disc held in the clutches of a monster, his head overtopping the whole. He symbolizes the human desire to cling to worldly existence. The wheel is divided into compartments representing the various worlds; the hells, the heavens, and the linked chain of the causes of rebirth. At the center are the three original sins of lust, anger and stupidity.

After a brisk feed on sandwiches carefully packed from Nor Khill, we pressed on, trying to make the most

of daylight for the onward journey to North Sikkim. The first village to pass was the sleepy Mangan : that overlooks the Teesta and the Lepcha reserve of Dzongu. The road from Mangan to Chungthang traces the Teesta going through thick forest.

Burbling mountain streams are constant companions till you come to Chumthang, at 5740 feet, projectedand embellished in the confluence of Lachen and Lachung rivers.

Just outside Chumgthang, the road bifurcates. Taking the left road we moved towards Lachung. The two valleys of Lachen and Lachung run northward to the Himalayas which divide Sikkim from Tibet. The journey is a feast for tired eyes and a dreary soul. Almost at every twist up the mountain you would come across a mountain torrent cascading down the hill slope or a sparkling waterfall gleaming against the deep green of the forest.

We were welcome in the Yarlam Resort, with traditional khhaada and tea. Each room in the resort was infused witha quiet composure that reflected the gravitas of the surrounding snowcapped peaks.

The following day started with a visit to the Singba Rhododendron sanctuary which is the reserve beyond the frontier village of Lachung en route Yumthang valley. Sir JD Hooker, the famous botanist who traveled through Sikkim in 1850 writes" the banks of rivers between 8000 feet to 12000 feet in altitude are covered by rhododendrons, sometimes to the exclusion of near wooded vegetation. "There are 40 species to be found in Sikkim.

The tree line in Sikkim continues to 14,700 feet, so Yumthang Valley at 11,800 feet is surrounded by an alpine forest and white slush topped mountain. It exudes irresistible charm when primulas and rhododendrons carpet the valley floor. Yumesamdong or (Zero point), about 24km from the valley brims plentiful with the fragrance of the azellia, a plant collected by the locals as incense.

The trail back to Chumthang is equally beautiful. Our driver now shoots straight for the right bifurcation for the uphill ride to Apple Orchard Resort in Lachen.

Lachen, meaning the Big Pass, is home to the Lachenpas belonging to the Bhutia community of Sikkim. The predecessors of the present day inhabitants built the hamlet along the verdant slopes set in resplendence against a backdrop of commanding snow coated peaks, glaciers and rock cliffs.

(Yumthang Valley in bloom)

At an altitude of 8838 feet, Lachenhas only about 200 homes and is one of the 31 sites handpicked by UNDP (United Nations Development Program) for stimulating village tourism. It is Sikkim's most scenic village effortlessly outdoing nearby Rabom, Chaten, Talem, Yakthang, Samdong and Thangu.

(View of Lachen)

The following two days were spent exploring the Chopta valley and taking the road to Gurudongmar Lake.

Light mountain drizzle with occasional thunder spotted the evening. We were jittery and nervous about the morning weather and trip to Gurudongmar.

It cleared a bit in the wee hours and our driver was ready to accelerate at 3:30 AM. Though May, it was cold and the plan was to reach the lake by 8 AM. Our idea was to stroll for 20 minutes and leave by 8:30 AM. The last wheel out of the lake area is around 10 AM.

Just 20 minutes' drive from Thangu the last village stands the Chopta Valley at 14,000 feet. The distance between Lachen to Thangu is 30 kilometers but takes close to 3 hours. The road is rough, uncomfortable and jerky, but the terrain is beautiful and you rise close to 4500 feet in this short span. The green vegetation of the lower heights soon transforms to Alpine terrain with canonical trees. Once, above tree line, there are only bushes that bleak in to vast lands of

Tibetan Plateau areaapproaching Gurudongmar Lake

Gurudongmar Lake, pristine and placid at 17800 feet

the Tibetan Plateau. An hour from Thangu is the Army check post, the last stop before the one hour drive up to Gurudongmar Lake.

Beyond Thangu, our army men skirt the road with tanks and other fire power. As the road steers to Gurudongmar Lake; the landscape becomes more barren. This is a cold desert.

In these seven days , sometimes lack of oxygen or a casual storm, dangerous roads and fluctuating weather drew my attention close to the comforts I am used to. I would ask why I preferred a vacation that came with a docket for physical hardship?

As I walked away from this awe inspiring creation hoping to behold this splash of calm splendor in my inward eye forever, I could only appreciate the bounty of nature and the mesmerising gems it handed out with every height I scaled !

I realized how important the summits were, but even more rewarding was getting there! Truly, the journey shapes the destination.

Shravani Datta, BS MBA, works in a Leadership role in healthcare in Chicago. She has lived in Europe, India and USA and has traveled extensively for both work and leisure.

Shravani began writing as a trainee journalist at the Telegraph News desk in Kolkata, where she contributed in the business pages of the daily. She has written for other newspapers and participates at the local poetry forum in Naperville, IL.

She lives in Naperville, IL with her husband, Aniruddha Basu.

Oregon Travel Experience

Saumen Chattopadhyay

It was on October 18th last year. The morning of a rainy Saturday. I looked through the window of my hotel room at Cascade Locks, Oregon. Layers of cloud sheltered on the sky the nature was in rainy mood. A glimpse of "The Bridge of the Gods" through dense fog looked mysterious. I didn't want to stay in the cozy hotel room; my mind was treading on the mountains of Oregon. Well, let me get out, I said to myself but no camera, OK? I just remembered I forgot the rain jacket for my camera let alone mine. I stepped out. The Pacific Crest trail was just on the other side, nestled inside a park. With dripping rainwater from my hat and wet jacket I hiked on. It was a steep rocky trail enveloped in mossy and tall pine trees. My footstep seemed to be the only noise breaking the still silence of the forest as it was waking up in twilight. I paid attention to my footstep on the slippery trail with uneven rocks while my senses immersed with the enigma of Pacific Crest trail that spiraled up in the mountain. I heard swift movements of deer and other animals disturbed by the presence of a stranger in their habitat. As the trail twisted at every turn the forest became more dense and impenetrable. Bewildered by the wilderness I started feeling the presence of an intangible being silently watching my movement in his kingdom. It was an uncanny atmosphere where nothingness surrounded all living being the flora and fauna of the forest. I was completely drenched but continued on my voyage with a keen desire to see the unseen.

Then appeared a valley at the end of the forest. I noticed the sign of "Dry Creek Falls" with an arrow pointing toward the beginning of another forest. I remembered the saying "you can't stay one corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes". I marched on with my curious mind having no fear of moving into unknowns. The trail became more treacherous with steeper slope. I forgot how long I hiked nor I had any desire to check the time on my cellphone. The notion of time appeared to fade away in my mind with a feeling that the "clearest way into the Universe is through forest wilderness". I didn't want to remember I belong to a civilized world! I lost my soul inside the soul of the forest. And then a sudden noise of footsteps altered my hearing sense. It was an offbeat sound beyond the realm of my expectation. Who could it be? The noise got more prominent and I was awe-stuck with the sudden appearance of an unearthly masculine figure with bald head running down the trail. I somehow held myself back in the corner to let him pass. He was running at a lightening speed and when I looked back, he disappeared. I tried to hear his fading footsteps, but no vein. When I gained my senses back I looked at the trail behind and it seemed humanly impossible to decent while running without the risk of falling down on the forest floor. Who was he? I asked myself.

I did reach Dry Creek Falls nestled in the mountain and it was an inexplicable experience. I was perplexed by the sight of the stranger not being able to grasp his supernatural, wind-like decent on a very steep slippery Pacific Crest trail. It baffled me so much. I asked the localites but no one could provide a plausible answer while one said "strange things happen in the deep forests of Oregon mountains".

The next day was sunny and I climbed up the same trail to take a few shots of Dry Creek Falls. I aspired to meet that "unknown" once again, but he was not present for an unknown reason.

Chicago, IL

"We have to choose JOY and keep choosing it"

“দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে ।
মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে,
বকুলশাখার চঞ্চলতায়
মর্মরে মর্মরে ।”

Art layout & printing by Neospectrum